www.bari.gov.bd

উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি

২০২৩-২৪

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি

২০২৩-২৪

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ

ড. মুহা. আতাউর রহমান

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ

ড. মো. আব্দুর রশীদ

মো. হাসান হাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশকাল
মে ২০২৫ খ্রি.

প্রকাশ সংখ্যা
২,০০০ কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে
লুবনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
৫৬, ভজ হরি সাহা স্ট্রিট
নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

Correct Citation: Akhond *et. al.*, 2025, Edited. Udbabito Krishi Projukti-2023-2024 (In Bengali), Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI), Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh.

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) প্রতিবছর গবেষণাধীন ফসলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নত জাত, উৎপাদন পদ্ধতি, মৃত্তিকা ও সেচ ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যাবস্থাপনা, উন্নত ফসল বিন্যাস, কৃষি যন্ত্রপাতিসহ নানা রকমের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে যা সচিত্র সন্নিবেশ করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের পুস্তিকা প্রকাশের মূল লক্ষ্য হলো অংশীজনদের নিকট তা যথাসময়ে পৌঁছে দেয়া। এছাড়া, এসব মূল্যবান তথ্য সংকলন করে সংরক্ষণ করাও পুস্তিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। অত্র ইনস্টিটিউট হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের মোট ২১ (একুশ)টি উন্নত উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এছাড়া, উন্নত ফসল বিন্যাস, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, উন্নত সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৩৩ (তেত্রিশ)টি লাগসই প্রযুক্তি এই পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে।

আমি আশা করি, পুস্তিকাটি প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমে ম্যানুয়াল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করে আমাদের দেশের কৃষকেরা উৎপাদন বৃদ্ধি করে নিজস্ব চাহিদা পূরণ করেও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ছাত্র-শিক্ষক, সম্প্রসারণবিদ ও কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মীরা পুস্তিকাটি দ্বারা উপকৃত হবেন। পুস্তিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক এই কামনা করছি। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পুস্তিকাটির সংকলন ও সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ

বিষয় সূচি

মেটেআলুর জাত

বারি মেটেআলু-৫ ——— ৯
বারি মেটেআলু-৬ ——— ৯
বারি মেটেআলু-৭ ——— ১০
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ১০

মিষ্টিআলুর জাত

বারি মিষ্টিআলু-১৮ ——— ১২
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ১৩

কাসাভার জাত

বারি কাসাভা-৩ ——— ১৫
বারি কাসাভা-৪ ——— ১৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ১৬

মটরের জাত

বারি মটর-৪ ——— ১৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ১৮

সরিষার জাত

বারি সরিষা-২১ ——— ২০
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ২০

তিসির জাত

বারি তিসি-৩ ——— ২৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ২৪

টমেটোর জাত

বারি টমেটো-২২ ——— ২৫
বারি টমেটো-২৩ ——— ২৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ২৬

লাউ এর জাত
বারি লাউ-৬ ৩০
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩১
হাইব্রিড ধুন্দুলের জাত
বারি হাইব্রিড ধুন্দুল-২ ৩৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৫
হাইব্রিড শসার জাত
বারি হাইব্রিড শসা-১ ৩৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৭
পানি ফলের জাত
বারি পানি ফল-১ ৩৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৮
লিলিয়ামের জাত
বারি লিলিয়াম-৩ ৪০
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪০
রসুনের জাত
বারি রসুন-৫ ৪৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৩
ধনিয়ার জাত
বারি ধনিয়া-৩ ৪৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৫
ঢেমশীর জাত
বারি ঢেমশী-১ ৪৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৮
নেগি অনিয়নের জাত
বারি নেগি অনিয়ন-১ ৫০
উৎপাদন প্রযুক্তি ৫১

কিনোয়ার জাত

বারি কিনোয়া-১ ——— ৫৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ——— ৫৩

বারি উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিসমূহ

লিলিয়াম ফুলের সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ প্রযুক্তি ——— ৫৫

স্বল্প খরচে ইথিলিন জেনারেটরের সাহায্যে বাণিজ্যিকভাবে কলা পাকানোর নিরাপদ কৌশল ——— ৫৬

আন্তঃফসল হিসেবে বারি বেগুন-১২ এর সাথে মুড়ি কাটা পেঁয়াজ চাষ ——— ৫৮

উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় বারি সরিষা-১৮ এর উৎপাদন কলাকৌশল ——— ৬০

চলনবিল এলাকায় কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রচলিত পাট-রসুন ফসল ধারার উন্নয়ন ——— ৬১

চিয়া চাষে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ——— ৬৪

আন্তঃফসল হিসেবে মুখীকচুর সাথে রসুনের চাষ ——— ৬৬

বারি উদ্ভাবিত বীজ বপন যন্ত্রের মাধ্যমে সারিতে বীজ বপন, উপকূলীয় এলাকার একটি লাভজনক ——— ৬৭

চার ফসলের পেঁয়াজ ভিত্তিক পেঁয়াজ (পাতাসহ)-পেঁয়াজ (বাল্ব)-রোপা আউশ-রোপা আমন ফসলধারা ——— ৭০

ট্রে পদ্ধতিতে আদার চারা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত মিডিয়া ——— ৭৩

আগাম জাত হিসেবে বারি আলু-৭৯ এবং ৭৭ দেশের উত্তরাঞ্চলে চাষের উপযোগী ——— ৭৫

রংপুর অঞ্চলে সুপারির বাগানে বিভিন্ন ধরনের আন্তঃফসল চাষ ——— ৭৭

ডগা কর্তনের মাধ্যমে মিষ্টিকুমড়ার ফলন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি ——— ৭৮

পালংশাকের ফলন বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার উর্বরতা উন্নয়নে ৪৫ দিনের কম্পোস্টের ব্যবহার ——— ৭৯

করলার ফলন ও গুণাগুণ বৃদ্ধিতে বোরন সারের ব্যবহার ——— ৮১

বোরন সার পাতায় সিঞ্চণ প্রয়োগে (Foliar spray) সূর্যমুখী চাষ ——— ৮২
পেঁয়াজের বৃদ্ধি ও ফলনে অ্যাজোটোব্যাক্টরের প্রভাব ——— ৮৪
আন্তঃফসল হিসেবে চীনাবাদামের সাথে পাতা পেঁয়াজের চাষ ——— ৮৬
সয়াবিনের প্রধান ক্ষতিকর পোকাসমূহের দমন ব্যবস্থাপনা ——— ৮৮
বপন সময় পরিবর্তনের মাধ্যমে সূর্যমুখীর হোয়াইট মোল্ড রোগ দমন ——— ৮৯
আগাছানাশক দ্বারা বিনা চাষে জাবড়া (মালচিং) প্রয়োগের মাধ্যমে রসুন আবাদে আগাছা দমন ——— ৯১
জাল (Net) ব্যবহার করে ফসলের পাখি তড়ানো ——— ৯৩
কাঁচা আমের ভ্যাকুয়াম ফ্রাইড চিপস্ তৈরিকরণ ——— ৯৪
এনজাইম নিষ্ক্রিয়করণের মাধ্যমে মুখীকচুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ ——— ৯৬
পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে সূর্যমুখী সারির প্রভাব ——— ৯৭
বাংলাদেশের পতিত-পতিত-রোপা আমন এবং পতিত-আউশ-রোপা আমন বিন্যাসে 'বারি আলু-৪১' জাতের অন্তর্ভুক্তিকরণ ——— ৯৯
বেগুনের ক্ষতিকর লাল মাকড় এর জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা ——— ১০১
তরমুজের কাণ্ডের আঠা ঝরা রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা ——— ১০২
মিঠা পানি এবং লবণাক্ত পানিরপর্যায়ক্রমিক সেচের মাধ্যমে উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ফসল উৎপাদন ——— ১০৪
মাটির কার্বন সমৃদ্ধকরণ ও ব্রোকলির ফলন বৃদ্ধিকরণে জৈব বর্জ্য থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট এর ব্যবহার। ——— ১০৬
পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ দমনের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ——— ১০৭
ফালি পদ্ধতিতে ভুট্টার সাথে মটরশুটি চাষ ——— ১০৯
উপকারী মাকড় নিওসেইলাস এর ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন ——— ১১১

মেটেআলুর জাত

বারি মেটেআলু-৫

প্রত্যেক হিল বা মাদায় ২-৫টি টিউবার থাকে যা ঘাড়ে এসে মিলে যায়। টিউবার অনিয়মিত। টিউবারের মাংসল হলুদ বর্ণের এবং বালুর মত টেক্সার যা কাটার পর এক মিনিটের মধ্যে অক্সিডেশন হয়ে বাদামী রং ধারণ করে সাথে হালকা গাম নির্গত হয়। বুলবিল প্রায়ই গোলাকৃতির হয় যার খোসা ধূসর থেকে হালকা বাদামী ও পুরু এবং মসৃণ। মাংসল সবুজাভ হলুদ হয়। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২২.৪৮ ± ১ । জাতটি β-ক্যারোটিন (২১.৬৫ মি.গ্রা./১০০ গ্রা.) সমৃদ্ধ । ফলন ৪১.৮০ টন/হেক্টর।

বারি মেটেআলু-৫

বারি মেটেআলু-৬

প্রত্যেক হিল বা মাদায় ১টি টিউবার থাকে। টিউবারের মাংসল হালকা হলুদ বর্ণের এবং বালুর মত টেক্সার যা কাটার পর এক মিনিটের মধ্যে অক্সিডেশন হয়ে বাদামী রং ধারণ করে সাথে হালকা গাম নির্গত হয়। বুলবিল প্রায়ই গোলাকৃতি, অনিয়মিত এবং সংকুচিত হয় যার খোসা বাদামী, পুরু, মসৃণ এবং কিছু অংশ অমসৃণ। মাংসল হলুদ কিন্তু চারপাশ সবুজাভ হয়। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৫৯ ± ১। জাতটি β-ক্যারোটিন (১৪.২৬ মি.গ্রা./১০০ গ্রা.) সমৃদ্ধ । ফলন ২৮.৯৯ টন/হেক্টর।

বারি মেটেআলু-৬

বারি মেটেআলু-৭

প্রত্যেক হিল বা মাদায় কম বেশি ৫টি করে টিউবার থাকে যা ঘাড়ে এসে মিলে যায়। টিউবার অনিয়মিত এবং কখনও হাতের আঙ্গুলের মত। টিউবারের মাংসল ক্রিম বর্ণের এবং বালুর মত টেক্সার যা কাটার পর দুই মিনিটের বেশি সময় লাগে অক্সিডেশন হয়ে হালকা বাদামী রং ধারণ করতে সাথে হালকা গাম নির্গত হয়। বুলবিল প্রায়ই ওভেট, গোলাকৃতি ও অনিয়মিত হয় যার খোসা ঘন বাদামী ও পাতলা এবং অমসৃণ। মাংসল ক্রিম রং হয়। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৯.২৫ ± ১। জাতটি β-ক্যারোটিন (৩৩.১৭ মি.গ্রা./১০০ গ্রা.) সমৃদ্ধ। ফলন ৬৮.৬৭ টন/হেক্টর।

বারি মেটেআলু-৭

উৎপাদন প্রযুক্তি

গাছ: একক (Simple) পাতা ফেদাড়ী এবং গোড়ার দিকে পাতা Alternate ও উপরের দিকের পাতা কাণ্ডের দুই পাশের একই স্থান থেকে উৎপত্তি হয় (Opposite)। পরিপক্ক পাতায় লোব ফাঁকা থাকে তবে কচি পাতায় লোব একটি আরেকটির উপরে দেখা যায়। বোঁটার গোড়ায় গোলাপী রঙ থাকে। কাণ্ড বাম থেকে ডান দিকে প্যাচানো। চারটি নরম রিহম থাকে। কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ৪৮৩ সে.মি. (৫ মাস ১৪ দিন বয়সে) যা সবুজ ও লোমহীন। গিঁট থেকে গিঁটের দূরুত্ব ২০ সে.মি. (মাটি থেকে ১ মিটার এর মধ্যে)।

জলবায়ু ও মাটি: মেটেআলুর জন্য সুনিষ্কাশিত গভীর বেলে দোআঁশ মাটি সর্বোত্তম। মাটিতে উত্তম pH হচ্ছে ৫.০-৭.০।

চাষাবাদ পদ্ধতি: চাষের গভীরতা ২০ সেমি (৮'') বা তার বেশী হলে কন্দের সঠিক বৃদ্ধির জন্য ভাল। মেটেআলুর বীজ রোপণের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

১) ঢিবি পদ্ধতি (Mound planting): এটি মাটির সমতল ছোট আকারের গর্ত করে উপরের মাটির সাথে জৈব পদার্থ যোগ করে ৫০-৬০ সেমি (২০-২৪'') উঁচু স্তুপ

তৈরি করা হয়। স্তুপ থেকে স্তুপের দূরত্ব ১-১.২ মিটার (৪০-৪৮'')। এই স্তুপ কন্দের সঠিক বৃদ্ধি, সহজে সংগ্রহ ও উচ্চ ফলন দিতে সহায়তা করে। প্রত্যেক স্তুপের মাঝখানে অঙ্কুরিত বীজ কন্দ রোপণ করা হয়।

ঢিবি পদ্ধতি

২) উঁচু ভেলী পদ্ধতি (Ridge planting): সাধারণত এঁটেল মাটিতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। উত্তম রুপে চাষ করা জমিতে ১ মিটার প্রস্থের উঁচু ভেলি তৈরি করা হয়। বীজ কন্দ উঁচু ভেলীতে রোপণ করা হয়। অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে ফলন বেশী হয়।

৩) সমতল পদ্ধতি (Flat planting): হালকা বেলে মাটিতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জমিতে সাধারণভাবে চাষ দিয়ে প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট দূরত্বে সারি করে বীজ কন্দ রোপণ করা হয়।

সমতল পদ্ধতি

রোপণের সময়: মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস (ফাল্গুন থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত মেটেআলু রোপণ করা যায়।

রোপণ দূরত্ব ও গভীরতা: বীজ কন্দ মাটির উপরিতল হতে ১০-১৫ সেমি (৪''-৬'') গভীরে ও ১.২ মি. × ১.২ মি. (৪′ × ৪′) বা ১.২ মি × ০.৯ মি (৪′ × ৩′) দূরত্বে রোপণ করা হয়।

বীজ প্রস্তুতি: খাদ্যোপযোগী মেটেআলুর ছোট আকারের কন্দ, কন্দের কাটা টুকরা বা সেট এবং বুলবিল বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছোট আকারের কন্দ (২৫০ গ্রাম-১ কেজি) পুরোটাই রোপণ করা হয়। বড় আকারের কন্দ কেটে টুকরা করে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য রেখে দেওয়া হয়।

বীজের হার: ২-২.৫ টন/হেক্টর।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি: মেটেআলুতে জৈব সারের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। হেক্টরপ্রতি ২০ টন গোবর বা খামারজাত সার ও ২ টন ছাই, ২৬০ কেজি ইউরিয়া, ৩০০ কেজি টিএসপি এবং ১৬০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর বা খামার জাত সার, ছাই ও টিএসপি সারের সবটুকু এবং অর্ধেক এমপি সার মাদা তৈরির

সময় মাদার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া অর্ধেক এবং অবশিষ্ট এমপি সারের অর্ধেক বীজ রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমপি সার বীজ রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আশ্রয়দাতা/খুঁটি দেওয়া: মেটেআলু লতানো উদ্ভিদ বিধায় বাউনি দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। (১) একক খুঁটি (২) পিরামিডীয় খুঁটি (৩) মাচা পদ্ধতি।

সেচ ও নিষ্কাশন: বীজ রোপণ ও বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে মার্চ থেকে মে (মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত মাটির আর্দ্রতা বুঝে ২/৩ টি হালকা সেচ দিলে ফলন ভাল হয় এবং পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: যখন অধিকাংশ পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে অথবা লতা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায় তখন মেটেআলু উত্তোলনের উত্তম সময়। মেটেআলুর জীবনকাল ৮ থেকে ১১ মাস।

সংরক্ষণ: মেটে আলু সাধারণ তাপমাত্রা অর্থাৎ ৩০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় সহজেই ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। ঠাণ্ডা ও উত্তম বায়ু চলাচলযুক্ত ঘরে ১-২ স্তরে ২-৩ ইঞ্চি বালুর স্তর দিয়ে বিছিয়ে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়।

মিষ্টিআলুর জাত

বারি মিষ্টিআলু-১৮

মোজাম্বিক থেকে সংগৃহীত গড় ১.১৫ লাইনটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি মিষ্টিআলু-১৮' জাত হিসেবে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। পাতার উল্টা দিকের শিরা সাদাটে বর্ণের কিন্তু উপরের পৃষ্ঠের শিরার উৎসে বেশ কিছু অংশ পর্যন্ত বেগুনী রঙের। কন্দমূল লম্বাটে ও অনিয়মিত। কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস কমলা বর্ণের, শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৩.৪৫±১%। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটাক্যারোটিনের পরিমাণ প্রায় ৮.৮৭ মিলিগ্রাম। জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। প্রতি হেক্টর গড় ফলন প্রায় ৪৩-৪৫ টন।

বারি মিষ্টিআলু-১৮

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতি: সুনিষ্কাশিত, উঁচু ও রৌদ্রজ্জ্বলসম্পন্ন জমি মিষ্টিআলু চাষের জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন। বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম তবে ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে মিষ্টিআলুর চাষ করা যায়। মাটির অম্লতা (pH) ৫.৬ থেকে ৬.০ হলে ভাল। মিষ্টিআলুর জন্য মাটির উপরের ৩০ সেমি পর্যন্ত গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করা প্রয়োজন। মিষ্টিআলু চাষের জন্য এঁটেল মাটি ভাল নয়। এঁটেল মাটিতে চাষ করলে কন্দ চিকন, লম্বা বা অনিয়মিত আকারের হয় ফলে বাজার মূল্য দারুণভাবে কমে যায়।

বংশবিস্তারের জন্য লতা প্রস্তুতি: মিষ্টিআলু সাধারণত লতার কাটিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়। রোগ জীবাণু মুক্ত সুস্থ, সবল, পরিপক্ক লতা হতে কাটিং প্রস্তুত করা হয়। লতার কাটিং এর দৈর্ঘ্য ২৫-৩০ সেমি (প্রায় ১ ফুট) হওয়া উচিত যাতে ২-৩ টি পর্ব বিদ্যমান থাকে। মিষ্টিআলুর লতার প্রথম কাটিং সর্বোত্তম ও ফলন বেশি দেয়।

রোপণের সময়: অক্টোবরের মাঝামাঝী থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত (কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ) মিষ্টিআলুর লতা রোপণ করা যায়।

রোপণ পদ্ধতি ও চারার সংখ্যা: মিষ্টিআলুর লতার কাটিং সমতল বেডে বা উঁচু ভেলি পদ্ধতিতে রোপণ করা যায়। তবে উঁচু ভেলি পদ্ধতিতে ফলন বেশি হয়। সাধারণত চরাঞ্চলে এবং সেচবিহীনভাবে চাষ করলে সমতল জমিতে ফারো করে লতার কাটিং লাগানো হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি, (২ফুট) এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০ সেমি (১ ফুট)। লতার অগ্রভাগ মাটির উপরে রেখে দুই থেকে তিনটি পর্ব সমান্তরাল ভাবে মাটির ৪ থেকে ৮ সেমি নিচে পুঁতে দিতে হবে।

এ পদ্ধতিতে রোপণ করলে প্রতি হেক্টর জমির জন্য প্রায় ৫৬ হাজার লতার প্রয়োজন হয়। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে লতা লাগানোর পর পরই সেচ দিতে হবে এবং চারা ভালভাবে না লাগা পর্যন্ত প্রয়োজনানুসারে ১-২ দিন পর পর সেচ দেয়া উচিত।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি: কৃষক ভাইয়েরা মিষ্টিআলুতে সাধারণত সার দিতে চান না। তবে সর্বোচ্চ ফলনের জন্য সুষম সার সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। সারের পরিমাণ নির্ভর করে মূলত মাটির প্রকৃত ও প্রকার ফসলের জাত, সেচ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর মিষ্টিআলুর জন্য সারের মাত্রা সারণী-১ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণী-১ (মিষ্টিআলুর জন্য সারের মাত্রা)

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	কেজি/হেক্টর	কেজি/বিঘা	কেজি/শতক
ইউরিয়া	২৫০-২৮০	৩৪.৪-৩৮.৬	০.১৪-০.১৬
টিএসপি	১৪০-১৭০	১৯.৩-২৩.৪	০.০৮-০.১০
এমওপি	২৩০-২৬০	৩১.৭-৩৫.৫	০.১৩-০.১৫
জিপসাম	৬০-৮০	৮.২৬-১১.০	০.০৩-০.০৫
জিংক সালফেট*	১০-১২	১.৩৮-১.৬৫	০.০০৬-০.০০৭
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট*	৯০-১২০	১২.৪-১৬.৫	০.১৫-০.১৭
বরিক এসিড*	৬-৮	০.৮৩-১.১০	০.০০৩-০.০০৪
গোবর	১০,০০০	১৩৭৭	৫.৫৯

*জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড এলাকাভেদে প্রয়োজন হয়।

সম্পূর্ণ গোবর বা খামারজাত সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড এবং অর্থেক ইউরিয়া ও এমপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্থেক ইউরিয়া ও এমপি রোপণের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে সারির পার্শ্বে (সারি থেকে উভয় দিকে ১০ সেমি দূরে) ফারো তৈরি করে প্রয়োগ করা উত্তম। সারের উপরি প্রয়োগের পর পরই গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে মাটি উঠিয়ে দিয়ে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চরাঞ্চলে বা সেচবিহীনভাবে চাষ করলে উপরোক্ত রাসায়নিক সার শতকরা ১০-১২ ভাগ কমিয়ে একসঙ্গে জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: মিষ্টিআলুর গাছ মাটিতে লেগে গেলে ৩০ দিন, ৬০ দিন ও ৯০ দিন পর ৩ বার সেচ দেয়া উচিত। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে পানি নিষ্কাশনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সময়মতো পানি সেচ মিষ্টিআলুর ফলন এবং বাজারজাতকরণের উপযোগী কন্দমূলের সংখ্যা, ওজন ও গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: মিষ্টিআলু দ্রুত বর্ধনশীল ফসল এবং এটি দ্রুত মাটিকে ঢেকে ফেলে ও আগাছাকে অবদমিত করে। তবুও গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে আগাছা দমন করা জরুরি। ভাল ফলনের জন্য চারা রোপণের পর এবং সারির উপরি প্রয়োগের আগে কমপক্ষে একবার আগাছা দমন করা অত্যাবশ্যক।

লতা নাড়ানো: চারা রোপণের ৫০-৬০ দিন পর থেকে মাসে অন্তত একবার লতা নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। এতে মিষ্টিআলুর পর্ব থেকে শিকড় গজানো তথা বাজারজাত অনুপযোগী কন্দমূল উৎপাদন এড়ানো সম্ভব হয় এবং ফলশ্রুতিতে কন্দের আকার ও ফলন বৃদ্ধি পায়।

কন্দমূল উত্তোলন ও ফলন: চারা রোপণের ১২০ থেকে ১৪০ দিন পর কন্দমূল উত্তোলন উপযোগী হয় তবে ১৬০ দিনের বেশি রাখলে শাঁস আঁশযুক্ত হয়। মাটির সাধারন 'জো'

অবস্থায় কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মিষ্টিআলু উত্তোলন করা হয়। উত্তম ব্যবস্থাপনায় উচ্চফলনশীল মিষ্টিআলুর জাতগুলোর ফলন ৩৫-৪০ টন/হেক্টর হয়ে থাকে।

মিষ্টিআলু সংরক্ষণ: মিষ্টিআলুর সংরক্ষণ গুণ খুব একটা আশাপ্রদ নয়। বাংলাদেশে মিষ্টিআলু সংগ্রহকালীন সময় মার্চ-এপ্রিল মাসে (মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য বৈশাখ) তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে উইভিলের আক্রমণ বৃদ্ধি পায় এবং কন্দমূল সহজেই নষ্ট হয়। মিষ্টিআলু সংরক্ষণের পূর্বে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেমন: ১. মিষ্টিআলু সংগ্রহের সময় মাটি সাধারণ 'জো' অবস্থায় অর্থাৎ মাটি যেন কাদাময় না থাকে। ২. ফসল সংগ্রহের পূর্বে লতা টান দিয়ে না ছিড়ে কাঁচি দ্বারা কেটে আলাদা করতে হবে। ৩. সংগ্রহের পর মিষ্টিআলু ৭-১০ দিন ছায়ায় ছড়িয়ে রেখে কিউরিং করে নিতে হবে। ৪. রোগাক্রান্ত কাটা বা থেতলানো এবং উইভিল আক্রান্ত মিষ্টিআলু দ্রুত বাছাই করে আলাদা করে ফেলতে হবে। ৫. কন্দমূলের ত্বক যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য ফসল সংগ্রহ থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর কিউরিংকৃত বাছাই করা নিখুঁত মিষ্টিআলু উত্তম বায়ু চলাচলযুক্ত ঘরে শুকনা বালি বিছিয়ে তার উপর একস্তর মিষ্টিআলু (৭৫ সেমি) আবার বালুর স্তর (১০ সেমি) এভাবে ৫-৬টি স্তরে সংরক্ষণ করা হয়। বায়ু চলাচলযুক্ত ঘর যেখানে তাপমাত্রা ১৬-১৮° সে. থাকে সেখানে মিষ্টিআলু ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

কাসাভার জাত

বারি কাসাভা-৩

প্রত্যেক গাছে ১৫টির বেশী বিপণনযোগ্য কাসাভা টিউবার থাকে যা সিলিন্ড্রিকাল (Cylindrical) দেখতে। টিউবার ঘন বাদামী এবং এর মাংশল সাদা বর্ণের হয়। মাংশল মিষ্টি তবে ৯-১০ মাসের পর থেকে তিতা হয়ে যায়। খোসা পাতলা থেকে ঘন যা সহজে ছাড়ানো যায়। গাছের দৈর্ঘ্য ৩২৮ সেমি., যার কাণ্ড সিলভার বর্ণের। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৪৩.৩৬ ± ১, স্টার্চের পরিমাণ ৩২.৪৫± ১ এবং ফলন ৫২.১৫ টন/হেক্টর।

বারি কাসাভা-৩

বারি কাসাভা-৪

বারি কাসাভা-৪

প্রত্যেক গাছে ১৭টির বেশী বিপণনযোগ্য কাসাভা টিউবার থাকে যা কোনিক্যাল-সিলিন্ড্রিকাল (Cylindrical) এর মত দেখতে। টিউবার গোলাপী-বাদামী এবং এর মাংসল ক্রিম বর্ণের হয়। মাংশল মিষ্টি তবে ৯-১০ মাসের পর থেকে তিতা হয়ে যায়। খোসা মোটা যা সহজে ছাড়ানো তুলনামূলক কঠিন। গাছের দৈর্ঘ্য ৩৪১.২৫ সেমি, যার কাণ্ড কমলা বর্ণের। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ৪২.৫৯ ± ১, স্টার্চের পরিমাণ ৩২.৫৯± ১ এবং ফলন ৪১.৪৫ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

গাছ: কাসাভা বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। কাসাভা গাছ দেখতে অনেকটা শিমুল গাছের মত বলে বাংলাদেশের অনেক এলাকায় এটি শিমুল আলু হিসাবে বেশী পরিচিত তাছাড়া কাসাবা, শিমলা আলু ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। স্টেম কাটিংয়ের মাধ্যমে কাসাভার বংশবিস্তার করা হয়। শীর্ষস্হ (Apical) পাতা বেগুনী (Purple), পরিপক্ক পাতা ঘন সবুজ (Dark green), পত্রবৃন্ত লালচে সবুজ (Raddish-green) এবং দ্বিমুখী শাখাবিন্যাস।

জলবায়ু ও মাটি: অতিরিক্ত বেলে ও এঁটেল মাটি বাদ দিয়ে সব ধরনের মাটিতেই কাসাভা চাষ করা যায়। রোপণের পদ্ধতির উপর মাটি নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভরশীল। পাহাড়ী এলাকার পতিত ঢালু জমিতেও কাসাভার চাষ করা যায়। তবে সু-নিষ্কাশিত দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটি কাসাভার চাষের উপযোগী।

চাষাবাদ পদ্ধতি: জমিতে সাধারণত তিনটি বিন্যাসে (Orientation) চারা বা কাটিং রোপণ করা হয়।

১) উলম্ব (Vertical) বিন্যাস: এ বিন্যাসে স্টেম কাটিং উলম্বভাবে কাণ্ডের ২-৩ অংশ মাটির নিচে রেখে রোপণ করতে হয়। এই বিন্যাস সাধারনত বালি মাটিতে রোপণ করার ক্ষেত্রে অনুরসণ করা হয়।

২) কৌণিক (Angle)বিন্যাস: এ বিন্যাসে স্টেম কাটিংকে ৪৫ ডিগ্রি কোনে কাণ্ডের ২/৩ অংশ মাটির নিচে রেখে রোপণ করতে হয়। সাধারনত মধ্যম উর্বর মাটিতে এ বিন্যাস পদ্ধতিতে কাসাভা রোপণ করা হয়ে থাকে আমাদের দেশে এ পদ্ধতিটি বেশি জনপ্রিয়।

৩) আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস: বিন্যাস স্টেম কাটিংকে আনুভুমিকভাবে মাটি ৫-১০ সেমি গভীরে রেখে মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। উন্নত উর্বর মাটিতে এ বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে এতে প্রচুর কন্দ হলেও আকারে ছোট হয়।

রোপণের সময়: সেচ সুবিধা থাকলে বছরের যে কোন সময় কাসাভা রোপণ করা যায়। তবে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল (ফাল্গুন-বৈশাখ) মাস পর্যন্ত কাসাভা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

রোপণ দূরত্ব, গভীরতা: অধিক শাখা-প্রশাখাযুক্ত জাতের কাসাভার ক্ষেত্রে রোপণ দূরত্ব ৯০ × ৯০ সে.মি. এবং কম শাখা-প্রশাখা যুক্ত জাতের ক্ষেত্রের রোপণ দূরত্ব ৭৫ × ৭৫ সে.মি. হলে ভাল ফলন হবে।

বীজ প্রস্তুতি বা স্টেম কাটিং প্রস্তুতি: কাণ্ড থেকে কাটিং সংগ্রহ করার পর রোপণ করতে দেরি করা উচিত নয়। তবে কাণ্ড থেকে কাটিং সংগ্রহ করার পর কাটিংগুলিকে একত্রিত করে পলিথিন ব্যাগে মুড়িয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে ৩ থেকে ৫ দিন রেখে দিলে স্প্রাউটিং তাড়াতাড়ি হয়। কাটিংকে রোপণের পূর্বে এ ধরনের ব্যবস্থাপনার আওতায় আনলে গাছের সতেজতা, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা এবং সাথে সাথে ফলনও বৃদ্ধি পায়।

বীজের হার: রোপণ দূরত্ব ৯০ × ৯০ সেমি হলে ১ হেক্টর জমির জন্য চারা বা কাটিং প্রয়োজন হবে ১২,৫০০টি এবং রোপণ দূরত্ব ৭৫ × ৭৫ সে. হলে ১ হেক্টর জমির জন্য চারা বা কাটিং প্রয়োজন হবে ১৮,০০০টি।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ভাল ফসল পেতে হলে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূর্ণ গোবর সার (১০.১৫ টন) ও টিএসপি (১২৫ কেজি) শেষ জমি চাষের সময় ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। অত:পর রোপণের ৬০ দিন পর থেকে প্রতি মাসে ১ বার ইউরিয়া (১৫০ কেজি) ও এমপি (২০০ কেজি) সার সমান চার কিস্তিতে প্রতিটি গাছের গোড়ার চারদিকে ১০ সেমি দূরে বৃত্তাকারে ৫ সেমি গর্ত করে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা: বন্যা বা বৃষ্টির পানি যাতে জমিতে না জমতে পারে সে জন্য নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। বৃষ্টির পানি সহজে চলে যাবার জন্য দুই সারি বা প্রতি সারির পার্শ্ব দিয়ে নালা তৈরি করে দিতে হবে। কাসাভা খরা সহ্যকারী গাছ হলেও প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা থাকলে ফলন অনেক বৃদ্ধি পায়।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: অন্যান্য ফসলের মত আগাছা কাসাভার ফলন কমিয়ে দিতে পারে তাই জমি সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। তাছাড়া আগাছা ভাইরাসের ভেক্টরের আবসস্থল হিসাবে কাজ করে।

ফসল সংগ্রহ: চারা রোপণের ৭ মাস পর থেকে কাসাভা গাছ থেকে কন্দ সংগ্রহ করা যায়। সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে কন্দের ফলন হেক্টরপ্রতি ৪০-৬০ টন সহজেই পাওয়া সম্ভব।

ফলন: কাসাভা কন্দের গড় ফলন ৫৪.৩১ টন/হেক্টর।

সংরক্ষণ: কাসাভার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল কন্দ গাছের সাথে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রয়োজনমত সংগ্রহ করা যায় তবে ৯-১০ মাসের পর থেকে তিতা হয়ে যায়।

মটরের জাত

বারি মটর-৪

বারি মটর-৪

জাতটির গাছ ৯৩-১৫৯ সেমি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। রবি মৌসুমে চাষযোগ্য, ফুল গোলাপী রঙের। জীবনকাল ৯৪-১০৩ দিন। প্রতিটি গাছে ২৩-৩৮ টি ফল ধরে।বীজ কালচে সবুজাভ বর্ণের। ১০০ বীজের ওজন ৯.৬৭-১৫.২৭ গ্রাম। জাতটির কচি পাতা ও সবুজ ফল সবজি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। জাতটি আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষোপযোগী। ফলন : ১.৬০ হতে ২.৩০ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: আমন/বোরো চাষ হয় এমন সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত, উঁচু বামাঝারী উঁচু দোআঁশ, পলি দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটিতে মটর ভাল জন্মে। উপযুক্ত 'জো' অবস্থায় জমির প্রকার ভেদে ২-৪ টি আড়াআড়ি ভাবে চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ডাল জাতীয় ফসলে সাধারণত সার কম পরিমাণ প্রয়োজন হয় তাই মটর চাষে রাসায়নিক সার কম পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে। মটর চাষের জন্য বিঘাপ্রতি (৩৩ শতকে) ৪-৫ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি এমওপি, ১০-১২ কেজি টিএসপি, ৭-৮ কেজি জিপসাম ও ১-১.৫ কেজি বোরন সার শেষ চাষের সময় মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: পানি জমেনা অথবা পানি নিষ্কাশনের নালা আছে এমন জমি মটর চাষের উপযুক্ত। একক ফসল অথবা রিলে (সাথী) হিসেবে বারি মটর-৪ জাতটি চাষের উপযোগী। একক ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত 'জো' অবস্থায় ২-৪ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। সেই সময় জমিতে আগাছা থাকলে তা যতদুর সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে।

বপনের সময়: কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় সপ্তাহ (নভেম্বরের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপনের উত্তম সময়, এতে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এছাড়াও নভেম্বর মাসের ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

বীজ প্রাইমিং ও বীজ হার: জমিতে আর্দ্রতা কম থাকলে বীজকে প্রাইমিং করার জন্য ৫-৬ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে বীজের পানি ঝরানোর পর বপন করলে সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজ বপন পদ্ধতি ও অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতার উপর বীজের হার নির্ভর করে। বীজ গজানোর হার ভালো হলে (শতকরা ৯০ ভাগ বা তার বেশি) প্রতি হেক্টরে একক চাষের ক্ষেত্রে ৮০-৯০ কেজি, আমন ধানের মধ্যে ছিটিয়ে বুনলে ৯০-১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। মাটি ও বীজ বাহিত অনেক জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষার জন্য মটর বীজ বপনের পূর্বে অবশ্যই প্রোভেক্স ২০০ ডবিউপি (কার্বোক্সিন+থিরাম) ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

বপন পদ্ধতি: মটর সহ ডাল জাতীয় সকল ফসলই দু'ভাবে অর্থাৎ সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার বা ১২ ইঞ্চি।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: মটর বীজ বপনের সময় জমিতে পরিমিত মাত্রায় রস না থাকলে বীজ বপনের পরপরই সেচ দিতে হবে অথবা বীজ বপনের পূর্বেই সেচ দিয়ে 'জো' অবস্থায় এনে বীজ বপন করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের জন্য অবশ্যই নালার ব্যবস্থা থাকতে হবে অন্যথায় সেচের বা বৃষ্টির পানি জমে থাকলে শিকড় পচে গাছ মারা যেতে পারে।

অন্তঃপরিচর্যা: ফসলের বৃদ্ধি ও কাঙ্খিত ফলনের ক্ষেত্রে আগাছা অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এজন্য জমিকে ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বীজ গজানোর ১৫-২০ দিন পর কোদাল দিয়ে দুই সারির মাঝ বরাবর কুপিয়ে মাটির উপরের শক্ত স্তর ভেঙ্গে দিলে এবং নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ, কর্তন ও সংরক্ষণ: সবজি হিসাবে সবুজ ফল ৭৫-৮০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায়। ডাল হিসেবে সংগ্রহ করতে চাইলে পরিপক্ক অবস্থায় যখন শতকরা ৮০ ভাগ গাছ শুকনো খড়ের মত রং ধারণ করে তখন গাছ কেটে বা উপড়িয়ে সংগ্রহ করতে হবে। সব ফল পেকে যাওয়ার আগেই কাটতে হবে, তা না হলে ফল ফেটে

বীজ ঝরে যাবে। সকালের দিকে ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় কারণ এই সময় কুয়াশা দ্বারা ফল ভিজে নরম হয়, যার ফলে ফল ফেটে বীজ ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বীজ সংগ্রহ করার পর রৌদ্রে শুকিয়ে বীজ ৮-৯% আর্দ্রতায় (যাতে দাঁত দিয়ে কাটলে কটকট শব্দ হয়) বায়ুনিরোধ পাত্রে গুদামজাত করতে হবে। বেশি পরিমাণ বীজ গুদামজাত করতে হলে প্রতি ১০০ কেজি বীজের জন্য ২ টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করে ডালের শুঁসড়ী পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ফলন: সবজি হিসেবে সবুজ ফলের ফলন প্রায় ৭.০-৭.৫ টন/হেক্টর। এছাড়া ডাল হিসেবে হেক্টর প্রতি বীজের গড় ফলন প্রায় ১.৬০ - ২.৩০ টন ।

সরিষার জাত

বারি সরিষা-২১

বারি সরিষা-২১

জাতটির জীবনকাল ৯৫-১১০ দিন। সরিষা-পাট/ডাল জাতীয় ফসল/ অন্যান্য ফসল- আমন ধান শস্যবিন্যাসে চাষের উপযোগী। উচ্চতা: ১৪০-১৬৫ সেমি। পাতা: হালকা সবুজ রঙের, অমসৃণ লোম এবং বোঁটা যুক্ত। শাখা: প্রাথমিক শাখার সংখ্যা সাধারণত ৩-৫টি। শাখাগুলি মাটির উপরে প্রধান কাণ্ড থেকে বের হয়। শাখা থেকে প্রশাখা বের হয়। ফুল: প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির নিচে থাকে। ফুলের রঙ হলুদ। প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা প্রায় ২৬৪ × ৪৭৪ টি। শুটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুটিতে বীজের সংখ্যা ১৬-১৯ টি। বীজ: বীজের রঙ হলুদ বর্ণের। ১০০০ বীজের ওজন ২.৫-৩.০ গ্রাম, বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩.০-৪৪.৫%। বপন কাল: ১৫ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর। প্রতি হেক্টরে ফলন ১৫০০-২৫০০ কেজি। লাকড়ি: ২.৫-৩.৩ টন/হেক্টর। অল্টারনেরিয়া রোগ সহনশীল।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া: সরিষা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে এবং ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে ভালভাবে জন্মায়। তবে, গাছের বৃদ্ধির জন্য ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তম।

জমি ও মাটি নির্বাচন: দো-আঁশ মাটি বারি সরিষা-২১ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বেলে দো-আঁশ ও এঁটেল মাটিতেও এর চাষ করা যায়। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এই জাতের জন্য নির্বাচন করা উচিত। বীজ গজানোর জন্য মাটিতে অবশ্যই উপযুক্ত রস থাকা দরকার।

জমি তৈরি: সরিষার বীজ ছোট বিধায় জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। পর পর ৪-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। জমিতে যাতে বড় ঢিলা ও আগাছা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মই দিয়ে জমি সমান করার পর ছোট ছোট পট করলে সেচ দেওয়া, পানি নিষ্কাশন ও অন্তর্বর্তীকালিন পরিচর্যায় সুবিধা হয়।

বীজের গজানো বা অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতা পরীক্ষা: জমিতে সঠিক সংখ্যার গাছ পেতে বপনের পূর্বে বীজরে গজানো ক্ষমতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। বপনের সময় বীজের গজানো ক্ষমতা শতকারা ৮৫ ভাগ হওয়া উচিত। বীজের গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের নিচে হলে বীজের হার বাড়িয়ে বপন করতে হয়।

সারের পরিমাণ: বারি সরিষা-২১ এর ভাল ফলন পেতে হলে নিম্নলিখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে এবং সারের মাত্রা কৃষি পরিবেশ অঞ্চল এবং জমির উর্বরতা ভেদে কম বেশি হতে পারে।

সারের নাম	হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)	বিঘা প্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২০০-২৫০	৮০-১০০	২৬-৩৫
টিএসপি	১৫০-১৭০	৬০-৭০	২০-২৪
এমপি	৭০-৮৫	৩০-৩৫	১০-১২
জিপসাম	১২০-১৫০	৫০-৬০	১৭-২০
জিংক অক্সাইড	০-৫	০-২	০.০-০.৬৭
বরিক এসিড	০-৫	০-৩	১.২৫-১.৫০
পচা গোবর	৫-৬ (টন)	৩.২-৪.০ (টন)	১.১-১.৩ (টন)

বপনের সময়: সরিষার বপন সময় শীত শুরুর সংঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণত আশ্বিন মাসের শেষ থেকে কার্তিক মাসের শেষ পর্যন্ত (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর) এ জাত বপন করার উপযুক্ত সময়। দেরীতে বপন করলে ফলন কমে যায়। দেশের উত্তর অঞ্চলে যেহেতু শীত আগে আসে সেখানে আগাম বপন করা সম্ভব। আমন ধান কাটার পর বেশি দেরি না করে সরিষা বপন করা উচিত।

বীজের হার:

হেক্টর প্রতি (কেজি)	একর প্রতি (কেজি)	বিঘা প্রতি (কেজি)
৬.০০-৭.০০	২.১-২.৪০	০.৭০ - ০.৮০

বপন পদ্ধতি: সারিতে এবং ছিটিয়ে উভয় প্রকারেই সরিষার বীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং সারিতে বীজ লাগাতার বপন করতে হয়। সারিতে বুনলে পরবর্তীতে আগাছা দমন ও অন্তর্বর্তী পরিচর্যা করা সহজ হয়। সারি তৈরির জন্য লোহার তৈরি টাইন অথবা ছোট কাঠের লাঙ্গল ব্যবহার করা যেতে পারে। আড়াই থেকে তিন সেমি গভীরে বীজ বপন করার পর মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। ছিটিয়ে বুনলে শেষ চাষের পর বীজ বপন করতে হবে এবং মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। সরিষার বীজ ছোট বিধায় বপনের সুবিধার জন্য বীজের সংগে ঝুরঝুরে মাটি অথবা ছাই মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সেচ প্রয়োগ: সরিষার ফলন বৃদ্ধির জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন। সাধারণত মাটিতে যে রস থাকে তার মাধ্যমে আমাদের দেশে সরিষার চাষাবাদ করা হয়। বর্তমানে যেখানে সেচের সুযোগ রয়েছে সেখানে উন্নত জাতের সরিষা সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয়। সেচ অধিক দিন গাছে পাতা ধরে রাখতে সাহায্য করে তাতে সরিষার ফলন অধিক হয়।

জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। কখনো কখনো বপনের সময় জমিতে রসের অভাব থাকে, সেক্ষে বপনের আগেই সেচ দিয়ে রসের ব্যবস্থা করতে হবে। ফুল আসার আগে অর্থাৎ বপন করার ১৮-২০ দিন পর এবং শুটি হওয়ার সময় ৫০-৫৫ দিনে জমিতে রস থাকা প্রয়োজন। কাজেই এ সময়ে জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে সেচ দেওয়া বাঞ্চনীয়। সরিষার জমিতে সাধারণত প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেচের পানি জমিতে আটকে না থাকে। ফোয়ারা পদ্ধতিতে সরিষার জমিতে সেচ দেওয়া উত্তম।

পরিচর্যা: চারা গজানোর ১০-১২ দিনের মধ্যে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিনে দ্বিতীয় বার নিড়ানী দিয়ে অতিরিক্ত চারা এবং আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হবে। প্রতি বর্গ মিটার জমিতে ৫০-৬০ টি সরিষার গাছ থাকা বাঞ্ছনীয়।

সেচ দেওয়ার পর জমিতে জোঁ আসার সথে সাথে কোদাল অথবা নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে দিলে জমিতে বেশি দিন পানি ধরে রাখা যায়। বাড়ন্ত অবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পোকামাকড় ও রোগ বালাই ফসলের ক্ষতি না করে।

ফসল কর্তন, বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ

পরিপক্কতার সময় অনুকূল আবহাওয়ায় সরিষা-আগাম বপন করলে পরিপক্কতা দেরী হয় কিন্তু দেরীতে বপন করলে অল্প সময়ে পরিপক্কতা আসে। আগাম বপন করলে সরিষা গাছের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দেরীতে বপন করলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির চেয়ে কম হয়ে থাকে। এ জাতের সরিষার পরিপক্কতার সময় ৮৪-৮৫ দিন। সরিষার ফলন এবং বীজের গুণগত মান বপনের সময় এবং কর্তন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

যখন গাছের শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ শুটি খড়ের রং ধারণ করে তখনই সরিষা কাটতে হবে। এ অবস্থা থেকে দেরি করলে বীজ ঝড়ে পরার সম্ভাবনা থাকে। সকালে শুটিসহ গাছ কেটে বা উপড়িয়ে মাড়াই করার স্থানে দিতে হবে এবং গাদা দিয়ে ২ থেকে ৩ দিন রাখতে হবে। পরে দুদিন রোদে গাছ শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়াই করতে হবে। এ সময় বীজের মধ্যে পানির পরিমাণ ২০% অধিক থাকা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে যে, শুটি যাতে মাঠে অতিরিক্ত পেকে না যায়। বেশি পেকে গেলে, বীজ ক্ষেতে ঝরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাঁশের লাঠি দিয়ে পিটিয়েও সরিষা মাড়াই করা যায়। বীজ কুলা দিয়ে ঝেড়ে রোদে ভালভাবে তিন-চার দিন শুকিয়ে নেবার পর ঠাণ্ডা করে শুষ্ক পাত্রে সংরক্ষণ করা উত্তম। সরিষার শুকানো বীজ অর্থাৎ ৮-১০% আর্দ্রতাসহ যে কোন পরিষ্কার শুকনো পাত্রে ঘরের শীতল স্থানে রাখলে বেশি সময় অর্থাৎ ২-৩ বছর বীজ সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত বীজ মাঝে মধ্যে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করতে হয়।

তিসির জাত

বারি তিসি-৩

জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় রবি মৌসুমে চাষ উপযোগী। ৮-১৪ dS/m লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। এটি উচ্চতায় ৬৫-৭২ সে. মি., গাছের গোড়ার দিক থেকে ও প্রধান কাণ্ডের সাথে গুচ্ছ আকারে ৭-৯ টি শাখা বের হয়, কাণ্ডগুলো মোটা ও শক্ত বলে হেলে পড়েনা। প্রতিগাছে ৭২-১০৫ টি ফল ধরে। প্রতি ক্যাপসুলে ৮-১০টি বীজ থাকে। বীজ গুলো আকারে বড় ও মোটা, ডিম্বাকৃতির, মসৃণ, চ্যাপ্টা ও হাল্কা বাদামী বর্ণের।ফলন ১.৩-১.৪ টন/হেক্টর। জীবনকাল ১১০-১১৮ দিন।

বারি তিসি-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: এঁটেল মাটি তিসির চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। পলি দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে তিসির চাষ করা যায়। সারা দেশেই তিসির চাষ কর যায় তবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে নোয়াখালীতে রবি মৌসুমে বেশী চাষ হয়ে থাকে।

বীজ হার: তিসি সাধারণত ছিটিয়ে বপন করতে হয়। তবে সারিতে বপন করা ভাল। ছিটিয়ে বপন করলে ১৫-১৭ কেজি/হেক্টর এবং সারিতে বপন করলে ১০-১৫ কেজি/হেক্টর।

বপন পদ্ধতি: সাধারণত বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। তবে উপকুলীয় এলাকায় ৬-৮ সেমি উঁচু বেডে সারি করে বীজ বপন করাই উত্তম। গাছ ঝোপালো হয় বলে প্রতি সারির মধ্যে ৪০ সেমি ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ১০ সেমি. ফাঁকা রাখলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বপন কাল: কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর হতে মধ্য-নভেম্বর)।

জমি তৈরি: তিসির বীজ ছোট বলে জমিতে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও ২-৩ টি মই দিয়ে মসৃণ ভাবে জমি তৈরি করতে হয়।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি: সাধারণত তিসি বিনা সারে চাষ করা হয়। তবে ভাল ফলন পেতে হলে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করা যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৭৫-৮০ কেজি
টিএসপি	১১০-১২০ কেজি
এমপি	৪০-৫০ কেজি

অর্ধেক ইউরিয়া সার ও অন্যসব সারগুলো শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করত হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনমত ১-২ বার সেচ দিলে ফলন ভাল হয়। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ: তিসি ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাকে। পাকলে গাছ এবং ফল সোনালী বা কিছুটা খড়ের রং ধারণ করে। ফসল ভালভাবে পাকার পরই গাছ কাটা বা উপড়ানো উচিৎ, কারণ ফল কাঁচা থাকলে বীজ অপুষ্ট থাকে। তাতে বীজের ওজন কম হয় এবং তেলের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার ফল বেশি পেকে গেলে জমিতে

রেখে দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ফল (ক্যাপসুল) তখন একটা চাপ খেলে অথবা ঝাকি লাগলে ফেটে যায় এবং বীজ পড়ে যায়। সুতরাং উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে যখন দেখা যায় ফলগুলো পেকে ফাটার উপক্রম হয়েছে তখন ফসল কাঁটা উচিৎ। ফসল কেটে বা উপড়িয়ে নেয়ার পর গাছগুলি ছোট ছোট আঁটি বেঁধে বাড়ীর আঙ্গিনায় স্তুপ করে রাখা যায়। গাছ কয়েকদিন রোদে ভালভাবে শুকাবার পর লাঠির সাহায্যে আস্তে আস্তে আঘাত করলেই ফল ফেটে বীজ বের হয়ে আসে। তখন গাছগুলো ঝাড়া দিয়ে বীজ হতে আলাদা করে ফেলা যায়। ডাটা ও খোসাসহ বীজগুলোকে কুলা, চালনী প্রভৃতির সাহায্যে পরিষ্কার করে নেয়া হয়। তিসির বীজ দু'তিন বার রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। মুখে ঢাকনাযুক্ত কেরোসিন টিনে অথবা পলিথিন ব্যাগে বীজ রেখে তা গুদামজাত করা যায়।

ফলন: প্রতি হেক্টরে ফলন ১.৩-১.৪ টন।

টমেটোর জাত

বারি টমেটো-২২

জাতটি চারা রোপণের ৬০-৬৫ দিন পর প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল মাঝারী আকারের লম্বাটে-গোলাকৃতির (high round shaped)। ফলের ওজন ১১০-১১৫ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩৫-৪০ টি ফল ধরে। মিষ্টতা (টিএসএস): ৪.৫০%। সংরক্ষণ কাল (শেলফ লাইফ)স্বাভাবিক ঘরের তাপমাত্রায়: ১০-১২ দিন। ফলন ৯০-১০০ টন/হেক্টর

বারি টমেটো-২২

বারি টমেটো-২৩

জাতটি উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। চারা রোপণের ৬২-৬৫ দিন পর প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল মাঝারী আকারের চ্যাপ্টা-গোলাকৃতির (flat round shaped)। ফলের ওজন ১২০-১২৫ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩৩-৩৬ টি ফল ধরে। মিষ্টতা (টি এস এস): ৪.৬০%। সংরক্ষণ কাল (শেলফ লাইফ)স্বাভাবিক ঘরের তাপমাত্রায়: ৮-১০ দিন। ফলন ৯০-৯৫ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো-২৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপন সময়: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (শীতকালে), এপ্রিল-মে (গ্রীষ্মকালে)।

সংগ্রহের সময়: ফেব্রুয়ারি-মার্চ (শীতকালে); জুলাই-সেপ্টেম্বর (গ্রীষ্মকালে)।

টমেটো একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর সবজি। কাঁচা কিংবা পাকা দুভাবে টমেটো খাওয়া যায়। খাবারের স্বাদ বাড়াতে টমেটোর জুড়ি মেলা ভার। অনেকে আবার সালাদে টমেটো খেয়ে থাকেন। টমেটো শুধু খাবারে স্বাদই বাড়ায় না, টমেটো থেকে তৈরি হয় নানা রকমের কেচাপ, সস।

জলবায়ু ও মাটি: টমেটোর শীতকালীন জাতগুলোর রাত্রির তাপমাত্রা ২৩০ সেলসিয়াস এর নীচে থাকলে তা গাছে ফুল ও ফল ধারণের জন্য বেশী উপযোগী। গড় তাপমাত্রা ২০°-২৫° সেলসিয়াস টমেটোর ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। উচচ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আদ্রতা টমেটো গাছে রোগ বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ঝরে পড়ে। তবে বারি টমেটো-২৩ জাতটি গ্রীষ্মকালে উৎপাদন উপযোগী কৃষকরা বাণজ্যিকি ভাবে সারা বছর চাষাবাদ করে লাভবান হতে পারবেন।

আমাদের দেশের সব রকমের উর্বর মাটিতে টমেটো চাষ করা যায় এবং ভাল ফলন দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় বেলে দোআঁশ থেকে এটেল দোআঁশ সব মাটিতেই টমেটো ভাল জন্মে। বন্যার পানিতে ডুবে যায় এমন জমিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়। মাটির অম্লতা ৬-৭ হলে ভাল হয়। মাটির অম্লতা বেশি হলে জমিতে ডলোচুন প্রয়োগ করা উচিত।

জীবনকাল: ১২০-১৫০ দিন

বীজের মাত্রা: প্রতি এক গ্রাম প্রায় ২৫০ টি বীজ থাকে। অঙ্কুরোদ্গমের হার ৯০% এবং প্রতিষ্ঠার/বাঁচার হার ৮০% বিবেচনায় বীজের পরিমাণ হলো ২০০ গ্রাম (প্রতি হেক্টরে) এবং ১ গ্রাম (প্রতি শতাংশে)।

রোপণ দূরত্ব ৬০×৪৫ সেমি হিসাবে এবং ১০ মিটার লম্বা, ১ মিটার প্রস্থ বেড এবং পার্শে ৩০ সেমি নালা হিসাবে প্রতি বেড এ ৪৪ টি চারার প্রয়োজন হয়। এই হিসাবে প্রতি হেক্টরে চারার প্রয়োজন হয় ৩২,২০০ টি এবং শতাংশ প্রতি চারার প্রয়োজন হয় ১৩০টি।

বীজ শোধন: ছত্রাক বাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজকে শোধন করা উচিত। তাহলে বীজ ছত্রাক বাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে। বীজ থেকে উৎপাদিত চারাও ছত্রাক বাহিত রোগ থেকে মুক্ত

থাকে। চারা রোপণের পর আরও ১৫-২০ দিন চারা ছত্রাক বাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকে। বহুল ব্যবহৃত ছত্রাকনাশক হল প্রোভেক্স। মাত্রা হল ২-৩ গ্রাম/১ কেজি বীজ। তাছাড়া কার্বেন্ডাজিম গ্রুপ এর ছত্রাকনাশকও ব্যবহার করা যায়।

বীজ বপনের সময়: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (শীতকালে); মার্চ-জুলাই (গ্রীষ্মকালে)।

চারা উৎপাদন

- ৩০-১০০ হোল বিশিষ্ট পটিং ট্রেতে চারা উৎপাদন করা অনেক সহজ।
- পটিং মিডিয়াতে ১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি এবং ভার্মিকম্পোস্ট মিশাতে হবে। আজকাল অবশ্য কোকোপিট নামক পটিং মিডিয়া কিনতে পাওয়া যায়, যা ব্যবহার করা চারার জন্য বেশ ভাল।
- পলিব্যাগ, পলিপট, পটিং ট্রে গুলোতে পানি, সূর্যালোক ও ছায়া প্রয়োজন মাফিক নিশ্চিত করতে হবে।
- সবসময় চারা সাদা ঘন নেট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যেন কোন ধরনের রোগের জীবাণু এবং ভাইরাস এর বাহক পোকা- সাদা মাছি প্রবেশ করতে না পারে।
- ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন) ও কীটনাশক (ইমিটাফ) এর স্প্রে শিডিউল ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

চারার বয়স ও চারা রোপণ

- চারার বয়স ২৫-৩০ দিন বা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করে গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে।

জমি তৈরি

- ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে যাতে জমিতে বড় বড় ঢিলা এবং আগাছা না থাকে।
- চারার রোপণ দূরত্ব জাত ভেদে ভিন্ন হয়।
- প্রতিটি বেড প্রস্থে ১০০ সেমি এবং লম্বায় দুটি সারিতে ৬০×৪৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করলে ২২ টি চারা সংকুলণনের জন্য ১০ মিটার হতে হবে।

বেডের প্রস্থ	:	১.০ মিটার
বেডের দৈর্ঘ্য	:	জমির দৈর্ঘের উপর নির্ভর করবে
রোপণ দূরত্ব	:	৬০ × ৪৫ সেমি
নালার প্রস্থ	:	৩০ সেমি

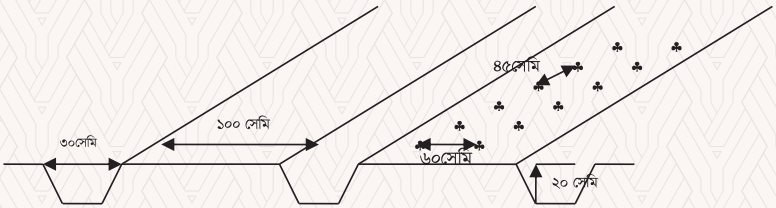

জমির লে-আউট

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (কেজি/ হেক্টর)

- টমেটো এমন একটি ফসল সার প্রয়োগ ব্যতীত যার সন্তোষজনক উৎপাদন চিন্তা করা যায় না।
- বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যের অভাব হলে গাছ দ্রুত বাড়ে না এবং পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের স্বল্পতা ফলনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সার	পরিমাণ	রোপণের ৭ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ	চারা রোপণের ১২-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৪০ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৮০-৯০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০০০০ কেজি	সব	-	-	-	
ভার্মিকম্পোস্ট	২০০০ কেজি	সব	-	-	-	
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	-	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি
টিএসপি	৩৫০ কেজি	সব				
এমওপি	২৮০ কেজি	৭০ কেজি	৭০ কেজি	৭০ কেজি	৭০ কেজি	
জিপসাম	১০০ কেজি	সব	-	-	-	
বোরিক এসিড	৫ কেজি	সব	-	-	-	
জিঙ্ক সালফেট	৫ কেজি	সব	-	-	-	
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫ কেজি	সব	-	-	-	

সেচ

- চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়।
- টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বেডের দুপাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক।

- অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে মৃদু ঢালু হওয়া বাঞ্চণীয়।
- প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সেচ দিলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না, তদুপরি পানির প্রয়োজন ও কম হয়। অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।

খুঁটি: টমেটো গাছ এর ভাল ও গুণগত ফলন পাওয়ার জন্য খুঁটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভারে হেলে না পড়ে।

মালচ পেপার ব্যাবহার: গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও মাটির পানির সঠিক ব্যবহার করার জন্য মালচ পেপার ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করলে আগাছা দমন হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। বাজারে ১.২ মিটার ও ১ মিটার প্রস্থ এবং ৫০০-৬০০ মিটার লম্বার মালচ পেপার পাওয়া যায়।

আগাছা দমন: নিড়ানী বা কোদাল দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হয়, তবে মালচ পেপার ব্যাবহার করে আগাছা দমন এ খরচ কম হয়।

পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই: টমেটো গাছে ১ম ফুলের গোছার ঠিক নীচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

- টমটো ব্যাবহাররে উপর নির্ভর করে তার সংগ্রহরে সময়। দূরর্বতী স্থানে সরবরাহরে উদ্দশ্যে হলে ফলের ঠিক নিচে লালচে ভাব শুরু হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে।
- ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হওয়া মাত্রই ফল সংগ্রহ করলে হবে বাজারজাতকরণের জন্য সুবধিা হয়। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ফলন: জাত ও মৌসুম ভেদে ফলনের পার্থক্য হয়ে থাকে।

বারি টমেটো-২২: ৯০-১০০ টন/হেক্টর

বারি টমেটো-২৩: ৮৮-৯৫ টন/হেক্টর (শীতকালে); ৩৮-৪০ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)।

ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা

- স্তুপাকারে না রেখে পাতলা করে ঠাণ্ডা ছায়া স্থানে প্লাষ্টিকের বাক্সে রাখতে হবে। সম্ভব হলে আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য ভিজা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

- বাজারজাতকরণের পূর্বে বাছাই (Sorting) ও গ্রেডিং করে নিতে হবে এবং তার পর খুব ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
- রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, অতি কচি, বাত্তি ও ভিন্ন রঙের ফলকে বাছাই করতে হবে।
- কৃষককে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

বীজ উৎপাদন

- বীজ উৎপাদনের জন্য ফল পুরাপুরি লাল বর্ণ ধারণ করলে তুলতে হবে। এতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের শতকরা হার প্রায় একশত ভাগ হবে।
- যদি বীজের পরিমাণ কম হয় তবে রেফ্রিজারেটরে বীজ রাখা যেতে পারে।
- সাধারণত ১৮° তাপমাত্রা ও ৪২% বাতাসের আদ্রতা বিশিষ্ট ঘরের পরিবেশ বীজ সংরক্ষণের জন্য উত্তম।
- বীজ ফলন: ২০০-২৫০ কেজি/হেক্টর (১.০ কেজি /শতাংশ)।

লাউ এর জাত

বারি লাউ-৬

জাতটি উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল নলাকার-বোতল আকৃতির (Czlindrical bottle shaped)। সাদা ছোপ যুক্ত সবুজ রং বিশিষ্ট ফল। প্রতি ফলের ওজন ২.৪-২.৫ কেজি। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ১০-১১টি। গড়ে ফলের দৈর্ঘ্য ৩৮-৪০ সেমি এবং ফলের প্রস্থ ১০-১১ সেমি। স্টেম ব্লাইট রোগ সহনশীল।

বারি লাউ-৬

ফলন: ৫০-৫২ টন/ হেক্টর (শীতকালে) এবং ৩৫-৪০ টন/ হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: বেশি শীতও না, আবার বেশি গরমও না এমন আবহাওয়া লাউ চাষের জন্য উত্তম। বাংলাদেশের শীতকালটা লাউ চাষের জন্য বেশি উপযোগী। তবে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা শীতকালে কখনও কখনও ১০° সে. এর নিচে চলে যায় যা লাউ চাষের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। লাউয়ের ভালো ফলনের জন্য সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা হলো দিনের বেলায় ২৫-২৮° সে. এবং রাতের বেলায় ১৮-২০° সে.। মেঘলা আবহাওয়ায় লাউয়ের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য উত্তম।

বীজের হার: হেক্টরপ্রতি ২-৩ কেজি (শতাংশ প্রতি ৮-১০ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজ বাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল-সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরি। কেজি প্রতি দুই গ্রাম ভিটাভেক্স/ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন:

- শীতকালে চাষের জন্য আগস্ট - অক্টোবর এবং গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য ফেব্রুয়ারি-মে মাসে বীজ বপন করা যায়।
- লাউ চাষের জন্য চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভাল হয়।
- বীজ বপনের জন্য ৮ × ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়।
- প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগে ভরতে হবে।
- সহজ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘণ্টা অথবা বীজ এক রাত্রি ভিজিয়ে অতঃপর পলিব্যাগে বপন করতে হবে।
- প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুন মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে।
- বীজ সরাসরি মাদায়ও বপন করা হয়। সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করা যেতে পারে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা:

- নার্সারিতে চারার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ

গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।

- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে।
- পলিব্যাগের মাটি চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- লাউয়ের চারাগাছে 'রেড পামাকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- চারার বয়স ১৫-১৬ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত গর্তে লাগাতে হবে।

জমি নির্বাচন এবং তৈরি:

- সেচ ও নিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।
- জমিকে প্রথমে ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন জমিতে কোন ঢিলা এবং আগাছা না থাকে।
- লাউ গাছের শিকড়ের যাথযথ বৃদ্ধির জন্য উত্তমরূপে গর্ত (মাদা) তৈরি করতে হবে।

বেড তৈরি এবং বেড থেকে বেডের দূরত্ব:

- বেডের উচচতা হবে ১৫-২০ সেমি। বেডের প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে।
- এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ নালা থাকবে এবং প্রতি দুবেড অন্তর ৩০ সেমি প্রশস্ত শুধু নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি এবং বেডে মাদা হইতে মাদার দূরত্ব

- মাদার আকার হবে ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি, গভীর ৫০-৫৫ সেমি এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি।
- বেডের যে দিকে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে।
- একটি বেডের যে কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দেয়া হবে, উহার পাশ্ববর্তী বেডের ঠিক একই কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে অনুরূপ নিয়মে মাদা করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার	সারের পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি)	জমি তৈরির সময় দেয়	মাদায় প্রয়োগ				
			চারা রোপণের ৭ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭৫ দিন পর
গোবর	১০ টন	৫ টন	৫ টন	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	-	-	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৮৭.৫ কেজি	৮৭.৫ কেজি	-	-	-	-
এমপি	১৫০ কেজি	৫০ কেজি	-	২৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি
জিপসাম	১০০ কেজি	সব	-	-	-	-	-
জিংক	১২ কেজি	সব	-	-	-	-	-
বরিক এসিড	১০ কেজি	সব	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৪০ কেজি	সব	-	-	-	-	-

অর্ধেক গোবর সার, টিএসপি এমওপি এবং সবটুকু জিপসাম, দস্তা, বোরাক্স ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট গোবর এবং টিএসপি চারা লাগানোর ৭ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগে ইউরিয়া এবং অবশিষ্ট এমপি সার সমান ৪ কিস্তিতে গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সেমি দূরে মাদারমাটির সঙ্গে ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারার বয়স: বীজ গজানোর পর ১৫-১৬ দিন বয়সের চারা মাঠে লাগানোর জন্য উত্তম।

চারা রোপণ:

- মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। অতঃপর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।
- চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে।
- পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং মাটির দলা না ভাংগে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের (ফিউজারিয়াম উইল্ট) জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা

- **সেচ দেওয়া:** লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। লাউয়ের জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

- **বাউনি দেওয়া:** লাউয়ের কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। লাউ মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।

- **মালচিং:** প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

- **আগাছা দমন:** কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ঘাস লাউতে 'বোট্‌ল্ গোর্ড মোজাইক ভাইরাস' নামে যে রোগ হয় তার আবাস স্থল। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

- **সার উপরি প্রয়োগ:** চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা

- গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

- লাউয়ের পরাগায়ন প্রধাণত মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টরপ্রতি ২-৩ টি মৌমাছির কলোনী স্থাপন করা যেতে পারে। বিকেলে হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করেও লাউয়ের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা নিম্নরূপে সনাক্ত করা যায়-

- ফলের গায়ে প্রচুর শুং এর উপস্থিতি থাকবে।

- ফলের গায়ে নোখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নোখ ডেবে যাবে।

- পরাগায়নের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।

- ফলের লম্বা বোঁটা রেখে ধারালো ছুরি দ্বারা ফল কাটতে হবে। ফল যত বেশি সংগ্রহ করা হবে ফলনও তত বেশি হবে।

হাইব্রিড ধুন্দুলের জাত

বারি হাইব্রিড ধুন্দুল-২

বারি হাইব্রিড ধুন্দুল-২

জাতের বৈশিষ্ট্য: এটি একটি হাইব্রিড জাত। কাঁচা অবস্থায় গাঁঢ় সবুজ রঙের। খাটো আকৃতির ফল কিন্তু উপরের প্রান্ত ও নিচের প্রান্ত ক্রমশ সরু। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২২৫ গ্রাম। ফলে কোন রুপ তিক্ততাভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফুল পরাগায়নের পর থেকে ৯ - ১১ দিন পরে তা ভক্ষণ উপযোগী হয়। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ১৩০-১৪০টি। ফল ধরা শুরু হওয়ার পর হতে প্রায় ৭০ দিন পর্যন্ত ফল ভালেভাবে সংগ্রহ করা যায়। এই হাইব্রিড জাতটি পাউডারী মিলডিও ও ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫২ টন/হেক্টর (শীতকালে) এবং ৩৫-৪০ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: দীর্ঘ সময়ব্যাপী উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ধুন্দুল ভালো জন্মে। পরিবেশগত ভাবে এটি একটি কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। এরা খরা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে পরাগায়ন বিঘ্নিত হয় ফলে, ফলন কমে যায়। শীতকালের ২/৩ মাস ছাড়া বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরেই ধুন্দুল চাষ করা সম্ভব।

উৎপাদন মৌসুম: বছরের যে কোন সময় ধুন্দুলের চাষ সম্ভব হলেও এদেশে প্রধানত খরিফ মৌসুমেই ধুন্দুলের চাষ করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি হতে মে মাসের মধ্যে যে কোন সময় পর্যন্ত ধুন্দুলের বীজ বপন করা যায়।

বীজ হার: ধুন্দুলের জন্য হেক্টরপ্রতি ৩-৪ কেজি এবং প্রতি শতাংশে ১২-১৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি: বাণিজ্যিক ভাবে ধুন্দুল চাষের জন্য উঁচু, পানি জমে থাকে না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। প্রথমে সম্পূর্ণ জমিকে ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি উপযুক্ত করে নিতে হবে। সম্পূর্ণ জমিতে ১.২ মি. চওড়া ও ১০-১৫ সেমি উঁচু করে বেড করে নিতে হবে। বেডের দৈর্ঘ্য জমির দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করবে এবং এক বেড হতে অন্য বেডের মাঝখানে কমপক্ষে ৬০ সে. মি. এর নালা রাখতে হবে। এর পর বেডের মধ্যে ৩-৩.৫ মি. পর পর মাদা তৈরি করতে হবে। উক্ত মাদাতে সরাসরি ২/৩টি বীজ বপন করা যেতে পারে অথবা পলিব্যাগে চারা তৈরি করে ১০-১৫ দিন বয়সের চারা মাদাতে লাগানো যেতে পারে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ধুন্দুলের জমিতে হেক্টর ও শতাংশ প্রতি নিম্নবর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	সারের পরিমাণ		জমিতে গর্ত তৈরির সময় দেয়		২০দিন পর/মাদা		৪০ দিন পর/মাদা		৪০ দিন পর/মাদা		৭৫ দিন পর/ মাদা	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	-	৪০ কেজি								
ইউরিয়া	১৮৫ কেজি	৭৪০ গ্রাম	-		৫৮ কেজি	২৩২ গ্রাম	৫৫ কেজি	২২০ গ্রাম	৫০ কেজি	২০০ গ্রাম	২২ কেজি	৮৮ গ্রাম
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম		৩৫০ গ্রাম							-	-
এমপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৭৫ কেজি	৩০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৯৯ কেজি	৪০০ গ্রাম	-	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-	-	-
জিঙ্ক সালফেট	১২কেজি	৫০ গ্রাম	-	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-	-	-
বোরাক্স/ বরিক এসিড	-	৪০ গ্রাম	-	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৬০ কেজি	২৪০ গ্রাম	-	২৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-	-	-

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে, সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে 'জো' এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা

সেচ দেওয়া: ধুন্দুল গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় বলে তখন সবসময় পানি সেচের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ সময় থেকে মে মাস পর্যন্ত খুব শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। তখন অনেক সময় কোন বৃষ্টিই থাকে না। উক্ত সময়ে ৫-৬ দিন অন্তর নিয়মিত পানি সেচের প্রয়োজন হয়।

বাউনি দেওয়া: ধুন্দুলের কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় বা কঞ্চিতে চাষ করতে হবে। ধুন্দুল কঞ্চিতে/মাচায় চাষ করলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন বেশি হওয়ায় ফলন ভাল হয়।

মালচিং: সেচের পর জমিতে চটা বাধে। চটা বাঁধালে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

আগাছা দমন: চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। ফলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায় না।

সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গাছ প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা: সময়মতো গাছের গোড়ায় শোষক শাখা অপসারণ করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ণ: ধুন্দুল এর পরাগায়ণ প্রধানত মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধারণের জন্য হেক্টরপ্রতি তিনটি মৌমাছির স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়াও কৃত্রিম পরাগায়ন করে ধুন্দুলের ফলন শতকরা ২০-২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ফসল তোলা (ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

ভাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে ২.৫-৩ মাসব্যাপি ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা নিম্নরুপ

- ধুন্দুলের ফল পরাগায়নের ৮-১০ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখায়।

ফলন: হেক্টরপ্রতি ৪৫-৪৬ টন ।

হাইব্রিড শসার জাত

বারি হাইব্রিড শসা-১

বারি হাইব্রিড শসা-১

জাতটি সারাবছর চাষ করা যায়। কাঁচা অবস্থায় হালকা সবুজ রঙের তবে সাদা ছোপ বিদ্যমান, পরিপক্ক অবস্থায় বোঁটার প্রান্ত হালকা খয়েরী রং ধারণ করে। প্রতি ফলের গড় ওজন ২৩০ গ্রাম। ফলে কোনরুপ তিক্ততাভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফলের গায়ে কচি অবস্থায় কাটা বা শুং দেখা যায়। ফুল পরাগায়নের পর থেকে ৮-১০ দিন পর তা খাওয়ার উপযোগী হয় । গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা প্রায় ২০-২৫ টি এবং ফল ধরা শুরু হওয়ার পর হতে প্রায় ২৮-৩০ দিন পর্যন্ত ফল ভালোভাবে সংগ্রহ করা যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৬০-৬৫ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপন সময় ও সংগ্রহের সময়: ফেব্রুয়ারি হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে যে কোন সময় পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। চারা গজানোর ৩৫-৪০ দিন পর লার গাছ ফল দিতে থাকে। পরাগায়নের ৭-৮ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। এ সময়ে ফল উজ্জ্বল দেখাবে এবং নির্দিষ্ট সাইজের হবে। প্রতি ২ দিন অন্তর অন্তর ভক্ষণ উপযোগী ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা ১ মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সার ব্যবস্থাপনা

সার	সারের পরিমাণ	জমিতে গর্ত তৈরির সময়	১৫ দিন পর/মাদা	৩০ দিন পর/মাদা	৪৫ দিন পর/মাদা
	হেক্টরে	হেক্টরে	হেক্টরে	হেক্টরে	হেক্টরে
গোবর	১০ টন	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৬৫ কেজি	-	৪৫ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
টিএসপি	১৬০ কেজি	সব	-	-	-
এমপি	১৪০ কেজি	৬৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫কেজি	২৫কেজি
জিপসাম	৮০ কেজি	সব	-	-	-
জিঙ্ক সালফেট	৫ কেজি	সব	-	-	-
বোরাক্স/ বরিক এসিড	৫ কেজি	সব	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৫কেজি	সব			

পানি ফলের জাত

বারি পানি ফল-১

বর্ষজীবি জলজ উদ্ভিদ। ফল আকারে বড় ও ত্রিভুজাকৃতির, ফলের রং মেরুন, শাঁস কচকচে, সুস্বাদু ও সাদা। প্রতি মৌসুমে দুই থেকে তিনবার ফল আহরণ করা যায়। ফলের গড় ওজন ১৮.৭০ গ্রাম এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪৩.৮৩। টিএসএস ৫.৪%। ফলন ৯.৮২ টন/হেক্টর।

বারি পানি ফল-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

উপযুক্ত জলবায়ু: পানিফল চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু সবচেয়ে উত্তম। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পানির তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গাছের বৃদ্ধির জন্য ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়।

মাটি: পানিফল বৃদ্ধির জন্য পানির নিচে আবশ্যিকভাবে ১৫ সেন্টিমিটার কাদামাটি থাকা প্রয়োজন। পানির তলদেশে বেলে মাটি থাকলে ফলন অনেকাংশে কমে যায়।

এছাড়া ভাল ফলনের জন্য পানির গভীরতা ৫০ সেন্টিমিটার থেকে ২.৫ মিটার হওয়া বাঞ্চনীয়।

রোপণ সময়: পূর্বের বছরের পানিফল চাষ করা জলাভূমি থেকে ফল সংগ্রহ করে, সংগৃহীত ফল থেকে পুষ্ট বীজ বেছে নিতে হবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে বীজতলায় বীজ ফেলতে হবে। এই সময় পানির গভীরতা ৪০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার থাকা প্রয়োজন। ৪ থেকে ৫ টি পাতাযুক্ত চারাগাছকে জুন মাস থেকে জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের সময় পানির গভীরতা ৬০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার হওয়া প্রয়োজন।

রোপণ দুরত্ব: চারাগাছগুলি সারি থেকে সারি ১.৫ মিটার এবং গাছ থেকে গাছ ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে কাদা মাটিতে হাত বা পা এর সাহায্যে পুঁতে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: চারাগাছ লাগানোর আগে মূল জমি তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন জমিতে উপযুক্ত পরিমানে জৈব পদার্থ থাকে। যদি জৈব পদার্থ কম থাকে তখন খামার জাত জৈব সার হেক্টর প্রতি ৫ টন হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও চারাগাছ লাগানোর সময় হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছ লাগানোর ২০ থেকে ২৫ দিন পর পুণরায় প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে। অনুখাদ্য হিসেবে জিংক এবং বোরন ব্যবহার করলে ফলের সংখ্যা ও ফলের ওজন বৃদ্ধি পাবে। নতুন চাষের জমিতে হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি ইউরিয়া, ২০ থেকে ৪০ কেজি ফসফরাস এবং ২০ থেকে ৪০ কেজি পটাশিয়াম ব্যবহার করতে হবে।

পরিচর্যা: গাছের ভালোভাবে বৃদ্ধির জন্য চারা রোপণের পর থেকে দুই মাস পর্যন্ত নিয়মিতভাবে জলজ আগাছা তুলে ফেলতে হবে। গাছের ফলন বৃদ্ধির জন্য ফুল আসার কিছুদিন আগে অতিরিক্ত ডালাপালা ছেঁটে ফেলা উচিত।

ফুল ও ফল আসা: আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই গাছে ফুল আসা শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে প্রায় ১২০ দিন পর্যন্ত। ফুল আসার ৩০ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যেই ফল তোলার মতো পরিপক্ক হয়। ফুল আসা এবং ফল ধরা একই গাছে পাশাপাশি চলতে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফসল তোলা শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। ফল তোলার সময় ফলের আকার দেখে তা সংগ্রহ করতে হবে। ফল তোলার শুরুর দিকে ১৫ দিনে একবার ফল তুলতে হবে, পরে তা সপ্তাহে একবার এবং নভেম্বর মাসে

প্রায় প্রত্যেক দিনই ফল তোলা যেতে পারে। হেক্টরপ্রতি ৭.৫ থেকে ১০ টন ফলন হয়ে থাকে । তবে সঠিক পরিচর্যা পেলে তা হেক্টরপ্রতি ১৫ থেকে ২০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।

বারি পানি ফল-১ চাষ

লিলিয়ামের জাত

বারি লিলিয়াম-৩

বারি লিলিয়াম-৩

ফুলের রং আকর্ষণীয় গাঢ় কমলা। ৫০% কুঁড়ি আসার সময়- ৪২-৪৫দিন। ফুলের স্টিকের দৈর্ঘ্য- ৫৫-৬৫ সেমি। প্রতি স্টিকে ফুলের সংখ্যা- ৫-৬টি। ফ্লোরেটের ব্যাস- ১৮-১৯ সেমি। ফুলদানিতে সজীবতা- ৮-৯দিন। বাল্বের ওজন- ৪৫-৫০ গ্রাম। ফলন- ২,৪০,০০০ - ২,৫০,০০০ স্টিক/হেক্টর। জাতটি ২০২৪ সালে অবমুক্ত করা হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: লিলিয়াম চাষের জন্য মৃদু আবহাওয়া প্রয়োজন। ভালোমানের ফুল উৎপাদনের জন্য দিনের তাপমাত্রা ২০-২৫° সে. এবং রাতের তাপমাত্রা ১০-১৫° সে. হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ লিলিয়াম আংশিক ছায়ায় মানসম্পন্ন ফুল প্রদান করে। ৫০% আলো প্রতিরোধ করতে পারে এমন UV পলিথিন/শেড নেট ব্যবহার করলে ভালো মানের ফুল উৎপাদন করা যায়। সুনিষ্কাশিত এবং পর্যাপ্ত জৈবসার সমৃদ্ধ বেলে দো-আঁশ মাটি লিলিয়ামের জন্য উপযোগী। সাধারণত এশিয়াটিক লিলিয়ামের জন্য মাটির pH ৬-৭ এবং অরিয়েন্টাল লিলিয়ামের জন্য pH ৫.৫-৬.৫ থাকা ভাল।

বংশবিস্তার: বীজ, কন্দ, শল্ক, গুঁড়ি কন্দ ও বুলবিল এর মাধ্যমে লিলিয়ামের বংশবিস্তার করা যায়। সাধারণভাবে চাষের জন্য 'কন্দ' রোপণ করা হয়। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরের সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আস্ত কন্দ মাটিতে বপন করা হয়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ: জমিতে ৪০-৪৫ সেমি গভীর করে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি পর পর কয়েকটি চাষ দিয়ে জমিটি ঝুরঝুরা করে তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির সময় মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কোকোডাস্ট (প্রতি বর্গ মিটারে প্রায় ১০-১৫ কেজি) মিশাতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। লিলিয়াম চাষের জন্য বেডের প্রস্থ ১.০-১.২ মিটার এবং উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি হলে ভাল হয়। বিভিন্ন অন্তর্বর্তী পরিচর্যা এবং জমির পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে দুই বেডের মাঝখানে ৩০ সেমি জায়গা খালি রাখতে হবে।

লবণাক্তের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে লিলিয়ামের জমিতে সার প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে কন্দ বপনের প্রথম ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত কোন সার মাটিতে প্রয়োগ না করাই ভাল। কন্দ বপনের প্রথম ৩ সপ্তাহ পর NPK ৩০:২০:২০ গ্রাম/প্রতি বর্গ মিটারে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তী ৩ সপ্তাহ পর প্রতি ১০০ বর্গ মিটারে ১ কেজি ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং ৬ সপ্তাহ পর প্রতি ১০০ বর্গ মিটারে ১ কেজি পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দিলে ফুল কাটার ৩ সপ্তাহ পূর্বে প্রতি ১০০ বর্গ মিটারে ১ কেজি পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উপরিপ্রয়োগ করা প্রয়োজন।

কন্দ বপন: বাংলাদেশে অক্টোবর-নভেম্বর মাস লিলিয়াম কন্দ লাগানোর উপযোগী সময়। লিলিয়াম কন্দ ১৫ সেমি × ১৫ সেমি দূরত্বে এবং ১০-১২ সেমি গভীরে বপন করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: লিলিয়াম চাষে পানি সেচ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিয়মিত পানি সেচ ভাল ফুল নিশ্চিত করে। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি লিলিয়ামের জমিতে সেচ প্রদানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। গাছ লম্বা হলে যেন হেলে না যায় এজন্য সঠিক সময়ে লিলিয়াম গাছে নাইলনের তৈরি সাপোর্টিং নেট দেয়া প্রয়োজন। গাছের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সাপোর্টিং নেটকেও উপরে উঠিয়ে দিতে হবে। এছাড়া মালচিং লিলিয়ামের জমিকে ঠাণ্ডা, ঝুরঝুরে ও আগাছা মুক্ত রাখে এবং এর ফলে মাটি বাহিত বিভিন্ন রোগের আক্রমণও কম হয়। সাধারনত মালচিং-এর জন্য খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ফুল সংগ্রহ: বীজ বপনের ৯০-১২০ দিন পরে ফুল সংগ্রহের উপযোগী হয়। দূরবর্তী বাজারে ফুল প্রেরণের ক্ষেত্রে স্টিকের নিচের দিকের ২-৩ টি ফ্লোরেটে হালকা রং

দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ফুল সংগ্রহ করা উচিত। ফুল পুরোপুরি ফোটার পর ফুল সংগ্রহ করলে পরিবহনের সময় ফুল নষ্ট হয়ে যায়। স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য যখন ১-২ টি ফুলের পাঁপড়ি খুলতে শুরু করে তখন ফুলের স্টিক কাটা উচিত। মাটির নিচে বাল্বের যথোপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য ভূমি থেকে স্টিকের ১০-১২ সেমি. উপরে কাটতে হবে।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: ফুল সংগ্রহের পর ফুলের সজীবতা ধরে রাখতে দ্রুত ছায়ায় এনে কর্তিত কাণ্ড থেকে প্রায় ১০ সেমি অংশের পাতা অপসারণ করতে হবে। রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত, নষ্ট ফুলের স্টিক বাছাই করে স্পাইক ও রেকিসের দৈর্ঘ্য, প্রতি স্পাইকে ফ্লোরেটের সংখ্যা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করে বাজারের চাহিদা অনুসারে আঁটি বাধতে হবে। সাধারণত একটি আঁটিতে ৮/১০ টি ফুলের স্টিক থাকতে পারে। সুবিধামত আঁটি তৈরি করে ফুলের নিচের দিকের ৪-৫ সেমি. অংশ বালতিতে চিনিসহ পানিতে (২-৪%) ২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ফুল অনেকক্ষণ সজীব থাকে। মাঠ তাপমাত্রা (Field heat) কে কমানোর জন্য সংগ্রহের পর ফুল ২-৫° সে. তাপমাত্রায় প্রাক-শীতলীকরণের ব্যবস্থা করলে সংক্ষণকাল বেড়ে যায়। সাধারন পানিতে জাত ভেদে লিলিয়াম ফুল প্রায় ৫-১৫ দিন পর্যন্ত তাজা থাকে।

কন্দ সংরক্ষণ: গাছে ফুল দেয়া শেষ হলে ভালো মানের বাল্ব তৈরির জন্য বাল্বকে ৪-৫ সপ্তাহ মাটিতে রেখে দিতে হবে। বিশেষ করে যখন পরিত্যাক্ত কাণ্ড শুকিয়ে যায় তখনই বাল্ব তোলার উপযুক্ত সময়। মাটি থেকে শুকনো কাণ্ডসহ কন্দ এমনভাবে তুলতে হবে যাতে কন্দ কোনভাবেই আঘাত প্রাপ্ত না হয়। তোলার পর বড়, রোগমুক্ত ভালো কন্দসমূহকে সংরক্ষণের জন্য বাছাই করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ছায়ায় শুকাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন শুধুমাত্র কন্দের উপরিভাগের আর্দ্র বা জলীয় অংশটুকুই শুধু শুকায়, কোনো অবস্থাতেই যেন অধিক শুকানোর জন্য কন্দ কুঁচকে বা কুঁকড়ে না যায়। শুকানোর পরপরই কন্দ প্লাস্টিক ক্রেটে আর্দ্র কোকোডাষ্ট-এ রেখে কোল্ড স্টোরেজে ২-৩° সে. তাপমাত্রায় ৬-৮ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বেশী দিন সংরক্ষণ করতে হলে উক্ত তাপমাত্রায় ২ সপ্তাহ রেখে পরবর্তীতে -১° সেলসিয়াস এ রাখা প্রয়োজন।

রসুনের জাত

বারি রসুন-৫

বারি রসুন-৫ জাতটির গাছের গড় উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেন্টিমিটার। কন্দের ফলন প্রায় ৯-১০ টন/হেক্টর। প্রতিটি রসুনের ওজন প্রায় ২২-২৫ গ্রাম। প্রতি রসুনে কোয়ার সংখ্যা প্রায় ১৭-২০ টি। কোয়ার রং হালকা সাদা। কোয়ার আকার বর্তমানে বিদ্যমান জাতের তুলনায় বড়, যার গড় ওজন প্রায় ১.৪-১.৬ গ্রাম। কোয়ার আকার বড় হওয়ার ফলে কন্দ থেকে কোয়া পৃথকীকরণ সহজ। এ জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। রসুনের ঝাঁঝ খুবই বেশি এবং এ জাতটি রোগবালাইয়ের প্রতি সহনশীল। মাঠ থেকে রসুন সংগ্রহকালীন পাতা কিছুটা সবুজ থাকে।

বারি রসুন-৫ এর গাছ

বারি রসুন-৫ এর কোয়া

বারি রসুন-৫ এর কন্দ

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: রসুন অগভীর গুচ্ছ মূল বিশিষ্ট কন্দ জাতীয় ফসল বিধায় এর জন্য সুনিষ্কাশিত উর্বর দো-আঁশ মাটির প্রয়োজন হয়। রসুনের মূল দুর্বল হওয়ায় কর্ষণীয় জমির (Top soils) গভীরতা কমপক্ষে ১৫-৩০ সেমি এবং মাটি হালকা (Loose) হওয়া বাঞ্চনীয়। রসুন অধিক জৈব পদার্থযুক্ত ৫.৫-৬.৮ পিএইচ (p^H) মানে ভালো ফলন দিয়ে থাকে। জমিতে পানি নিকাশের সুব্যবস্থা না থাকলে কন্দ বড় হয় না এবং রসুনের রং খারাপ হয়ে যায়।

রোপণ সময়: ঠাণ্ডা আবহাওয়া অনুকূল বলে, বাংলাদেশে সর্বত্র রবি মৌসুমে (শীতকাল) বারি রসুন-৫ জাতের রসুনের চাষ করা যায়। সাধারণত সমতল ভূমিতে নভেম্বর-মার্চ (১৫ কার্তিক-১৫ চৈত্র) মাসে রসুনের চাষ করা হয়ে থাকে। তবে রসুন নিম্ন তাপমাত্রার ফসল বিধায় জমির প্রাপ্যতা এবং 'জো' অবস্থা সাপেক্ষে ১৫ অক্টোবর (কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ) রসুন চাষ করলে অনেক ভালো ফলন পাওয়া যায়।

জমি তৈরি: কমপক্ষে ১৫ সেমি গভীর পর্যন্ত কর্ষণীয় জমি ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করা হয়। আগাছাসহ অন্যান্য আবর্জনা ভালোভাবে পরিষ্কার করে কোয়া রোপণ করা হয়।

বংশবৃদ্ধি: রসুনকে ৩টি মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা যায় যথা- কোয়া, বুলবিল (Bulbil) এবং প্রকৃত বীজ (True seeds)। রসুনে কোয়ার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি সর্বাধিক প্রচলিত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রকৃত বীজের মাধ্যমেও রসুনের চাষ করা হয়ে থাকে।

রোপণ পদ্ধতি: রোগবালাই ও জখমমুক্ত সুস্থ কোয়া রোপণের জন্য বাছাই করা হয়। ছোট কোয়া রোপণ করা উচিৎ নয়। নিম্ন লিখিত ২টি পদ্ধতিতে রসুন চাষ করা হয়ে থাকে।

(ক) ডিবলিং (Dibbling) পদ্ধতি: প্রথমে এ পদ্ধতিতে রসুনের জমিকে সেচের সুবিধার জন্য অনেকগুলো প্লটে বিভক্ত করা হয়। পরে কোয়ার অঙ্কুরোদ্গমের প্রান্ত উপরের দিকে রেখে ৫-৭ সেমি মাটির গভীরে রোপণ করা হয়ে থাকে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সেমি বজায় রেখে প্রতি সারিতে ১০ সেমি পর পর কোয়া রোপণ করা হয়। কোয়া রোপণের পর ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সাধারণত এ পদ্ধতিতে নরম মাটিতে সুতা দিয়ে লাইন করে কোয়া মাটিতে রোপণ করতে হয়।

(খ) নালা (Furrow) রোপণ পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে সুনিষ্কাশিত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ চাষকৃত দোঁ-আশ মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে সোজা নালা তৈরি করে কোয়া রোপণ করা হয়। নালা রোপণ পদ্ধতি রসুন চাষের জন্য ভালো। একটি আদর্শ ব্লক (৪ মিটার লম্বা এবং ১.৫ মিটার প্রস্থ) নির্মাণ করে ব্লকের মধ্যে রো-কোদাল দিয়ে ২.৫-৩.০ সেমি গভীর নালা তৈরি করা হয়। নালার মধ্যে ১০ সেমি পর পর কোয়া রোপণ করা হয়। এক নালা থেকে অন্য নালার দূরত্ব ১৫ সেমি বজায় রাখা হয়। রসুন বিলম্বে রোপণ করলে রোপণ দূরত্ব ঘন করতে হয়। কোয়া রোপণের পর পার্শ্ববর্তী ঝুরঝুরা মাটি দিয়ে কোয়া ঢেকে দেওয়া হয়। রোপণের পর মাটির অবস্থা বুঝে হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ: উষ্ণ/অব-উষ্ণ অঞ্চলে রসুন ৫-৫.৫ মাসের ফসল। রসুন রোপণের দুই মাস পর থেকে কন্দ গঠিত হতে থাকে। সাড়ে তিন মাস পরে কন্দ পুষ্ট হতে শুরু করে। ১৪০-১৫০ দিন পরে রসুন উত্তোলন করা যায়। রসুন গাছের কিছু লক্ষণ (Signs) দেখে কন্দ তোলার উপযুক্ত সময় বোঝা যায়। পাতা হলদে বা বাদামী হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকলে বুঝতে হবে রসুন পরিপক্ক হয়েছে। তবে সংগ্রহের সময় এ জাতটির পাতা হালকা সবুজ থাকে। এক্ষেত্রে কন্দের বাহিরের দিকের কোয়াগুলো পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বিভাবে ফুলে উঠে এবং দুটি কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায়। গাছ হাত দিয়ে টেনে তুলে মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে। এরপর কন্দগুলি পাতাসহ ছোট ছোট আটি বেঁধে ৩-৪ দিন রোদে শুকানো (Curing) হয়। শুকানোর পর কন্দের ২.০-২.৫ সেমি উপরে গলা (Neck) কেটে পরিষ্কার করে সংরক্ষণাগারে রাখা হয়।

সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা: শুকনা রসুন সহজে আলো বাতাস চলাচল করে এমন ঘরের ছাদে বাঁশের লাঠিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এতে রসুন সবচেয়ে ভাল থাকে। রসুনের পরিমাণ বেশী হলে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থাযুক্ত অ্যাম্বিয়েন্ট স্টোরেজে সাধারণ তাপমাত্রায় (২৫-৩০° সে.) এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (৬০-৭০%) রসুন স্তুপ আকারে রাখা যেতে পারে। এছাড়া হিমাগরে ০-২° সে. তাপমাত্রায় এবং শতকরা ৬০-৭০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় রসুন ভালভাবে বেশী দিন রাখা যায়।

ফলন: রসুনের জাত, আবহাওয়া, পরিবেশ, চাষ পদ্ধতি, রোগ-বালাই, আন্ত:পরিচর্যা ইত্যাদির উপর ফলন নির্ভর করে। সাধারণত বারি রসুন-৫ হেক্টর প্রতি গড়ে ৯-১০ টন পর্যন্ত ফলন দিয়ে থাকে। তবে রসুনে উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে এর ফলন ১২ টন/হেক্টর (Potential yield) পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে।

ধনিয়ার জাত

বারি ধনিয়া-৩

বারি ধনিয়া-৩

বারি ধনিয়া-৩ সারা বছরব্যাপি চাষ করা যায়। বীজ বপনের ৪৫-৬৫ দিন পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যায় এবং শীতকালে অনান্য ধনিয়ার জাতের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে বীজ উৎপাদন করা যায়। গাছের গড় উচ্চতা ১৫-২০ সেমি, পাতার রং গাঢ় সবুজ, একটি গাছে পাতার সংখ্যা ৬-৮ টি, গোড়ার পাতা লম্বায় ১২-১৪ সেমি., একক গাছের পাতার ওজন ৩-৪ গ্রাম, আম্বেলের সংখ্যা ৪০-৫০ টি, প্রতিটি আম্বেলে আম্বেললেটের সংখ্যা ৪-৫ টি, প্রতিটি আম্বেললেটে বীজের সংখ্যা ৪-৫ টি। জাতটির ১০০০ টি বীজের ওজন প্রায় ১০-১১ গ্রাম। এ জাতের পাতা বাজারে প্রাপ্ত ধনিয়া পাতার মতোই সুগন্ধীযুক্ত। এছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে উল্লেখিত লাইনটি গ্রীষ্মকালেও বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। হেক্টর প্রতি ফলন ৯-১০ টন সবুজ পাতা এবং ১.২৫-১.৫০ টন শুকনো বীজ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া ও মাটি: ধনিয়া ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফসল। শুষ্ক ও কুয়াশামুক্ত মোটামুটি ভাবে ঠাণ্ডা আবহাওয়া ধনিয়া চাষের উপযোগী। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১৮-২০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা দরকার হয়। তাই রবি মৌসুম অর্থাৎ শীতকালে এর চাষাবাদ করা হয়ে থাকে কিন্তু পাতার জন্য বাংলাদেশে সারা বছরব্যাপী চাষ করা

হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী হলে পাতা উৎপাদন ব্যহত হয়। ধনিয়া অতিবৃষ্টি ও উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। আর্দ্রতা অধিক হলে রোগের আক্রমণ বেশি হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এর চাষাবাদ পরিলক্ষিত হয়।

সব রকমের মাটিতেই ধনিয়া চাষ করা যায়। তবে অধিক জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ হতে বেলে দোআঁশ মাটি ধনিয়া চাষের জন্য উপযোগী। মাটির pH ৬.৫-৭.৫ ধনিয়া চাষের উপযোগী। ধনিয়া পাতা আবাদের জন্য পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

বীজ বপন সময়: সাধারণত নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহ হতে ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তবে এ জাতের বীজ সারা বছরব্যাপি বপন করা যায়। উল্লেখ্য যে, গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত সূর্যালোকে এবং বেশী বৃষ্টিপাতের ফলে অঙ্কুরোদ্‌গম ব্যহত হয় এবং পাতা নষ্ট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে জমিতে পলিথিন দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করে বছরব্যাপি বপণ ও উৎপাদন করা যায়।

বীজ বপন পদ্ধতি: ধনিয়া ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যায়। ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করলে ৩ মি. × ১ মি. বেড তৈরি করে প্রতি বেডের সাথে ৫০ সেমি নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেডগুলি উচু করে তৈরি করতে হবে। সারিতে বপন করলে সারি হতে সারির দূরত্ব ১৫ সেমি বজায় রেখে সারিতে ক্রমাগত ভাবে বীজ বপন করতে হবে।

বীজ হার: ধনিয়ার বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যায়। ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হেক্টর ৪৫-৫০ কেজি ও সারিতে বপন করলে ৩৫-৪০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ মিশিয়ে ১-২ সেমি মাটির গভীরে বীজ বপন করে মাটি দিয়ে নালা ঢেকে দিতে হবে।

অঙ্কুরোদ্‌গম পদ্ধতি: গ্রীষ্মকালে ধনিয়ার পাতা চাষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম। এর উপর নির্ভর করে পাতার ফলন । তাই ধনিয়া বীজ বপনের জন্য যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। ধনিয়া বীজ প্রথমে রোদে ৪-৬ ঘন্টা ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে এরপর বীজকে ছায়ায় রেখে ঠাণ্ডা করতে হবে। ঠাণ্ডাকৃত বীজকে ১২-১৬ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। উক্ত বীজ গুলোকে ভিজা পাটের চটদ্বারা আবৃত করে ৪-৫ দিন রেখে দিতে হবে এবং মাঝে মাঝে খেয়াল রাখতে হবে যেন পাটের চট শুকিয়ে না যায়। এভাবে ৪-৫ দিন রেখে দিলে বীজগুলি স্প্রাউট হবে। স্প্রাউটকৃত বীজ ২ সেমি গভীরকরা নালার মধ্যে ১-২ সেমি মাটির গভীরে বপন করতে হবে। বীজ বপনের পর মাটি দিয়ে নালা ঢেকে দিতে

হবে। বীজ বপনের ১ দিন পর জমিতে সেচ দিতে হবে, যেন সমস্ত জমিতে পযার্প্ত আর্দ্রতা থাকে।

জমি তৈরি: জমিতে ৪-৫ টি গভীর ভাবে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝরে করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা ও পূর্ববতী ফসলের আর্বজনা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ধনিয়া পাতা ফসল আবাদের জন্য মধ্যম উর্বর মাটিতে প্রতি হেক্টরে সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নে ছকে দেয়া হল:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/ হেক্টর
গোবর	৫ টন
ইউরিয়	১৯০ কেজি
টিএসপি	১৫০ কেজি
এমওপি	৬০ কেজি

জমি তৈরির সময় গোবর, টিএসপি, এমপি সমস্ত ও ইউরিয়া সার অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর বীজ বপন করে সেচ দিতে হবে এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ অঙ্কুরোদ্গমের ৮-১০ দিন পর ১ম কিস্তি এবং বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর বাকি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য পাতা উঠানোর ১২-১৫ দিন আগে শেষবার সার প্রয়োগ করলে পাতার রং এবং মান ভাল থাকে।

ফসলের পরিচর্যা

আগাছা দমন: গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। প্রতিবার সেচের পর জমির 'জো' আসা মাত্র মাটির চটা ভেঙ্গে দিলে গাছের শিকড় প্রচুর পরিমাণে আলো বাতাস পাবে, ফলে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত এবং সতেজ ও সবল হবে।

গাছ পাতলাকরণ: পাতা ফসলের জন্য গাছ পাতলাকরণের কোন প্রয়োজন হয় না তবে বীজ ফসলের জন্য বীজ গজানোর ১০-১৫ দিন পর থেকে ২-৩ ধাপে গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ৮-১০ সেমি রেখে পাতলা করে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: বীজ বপনের ১ দিন পর একটি হালকা সেচ দিতে হবে যাতে সর্বত্র পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকে। এতে করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম দ্রুত হবে। জমির প্রকার ভেদে ধনিয়াতে ২-৩ টি সেচ দিতে হবে। ধনিয়া গাছ জমিতে পানি জমে থাকা সহ্য

করতে পারে না। তাই জমাকৃত অতিরিক্ত সেচের পানি বা বৃষ্টির পানি ১-২ ঘণ্টার মধ্যেই নালা দিয়ে বের করে দিতে হবে। তবে গ্রীষ্মকালে অতিসূর্যালোকের সময় জমিতে সেচ না দিয়ে পড়ন্ত বিকাল বেলা সেচ প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে জমি ভিজা থাকলে সেচ প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে জমিতে সেচ দেওয়ার পর এবং বৃষ্টিপাতে অতিরিক্ত পানি আটকে থাকলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হওয়ার সাথে সাথে গোড়াপচা রোগের দেখা দিতে পারে।

ফসল সংগ্রহ: বীজ বপনের ৪৫-৬৫ দিন পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যায়। গাছের কাণ্ড লম্বা হওয়া শুরুর সময় হলো পাতা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। এসময় পাতার ফলন সর্বোচ্চ হয়। তবে শাখা প্রশাখা বের হয়ে ফুল আসা শুরু হলে পাতার মান নষ্ট হয়ে যায়। পাতা সংগ্রহ করে দূরে কোথাও পাঠাতে চাইলে পাতাগুলিকে পানিতে ভিজানো যাবে না, ভিজাইলে পাতা বেশীক্ষণ রাখা যায় না নষ্ট হয়ে যাবে। পাতা উঠানোর পর গোড়ার মাটি ও পচা পাতাগুলো হাত দ্বারা ভালোভাবে পরিস্কার করে বাজারে নিতে হবে।

ফলন: বারি ধনিয়া-৩ এর ফলন প্রতি হেক্টরে ৯-১০ টন সবুজ পাতা এবং শুকনো বীজ ১.২৫-১.৫০ টন।

ঢেমশীর জাত

বারি ঢেমশী-১

ঢেমশী গাছের গড় উচ্চতা ১০০ সেমি। জাতটির গড় ফলন ০.৭ - ০.৮ টন/হেক্টর। বীজ ত্রিভুজ আকৃতির কালো ছাই বর্ণের। হাজার দানার ওজন গড়ে ১৫ গ্রাম। জাতটি গড়ে ৭৭-৮০ দিনে পরিপক্ক হয়। উচ্চ প্রোটিন, ফাইবার এবং মিনারেল সমৃদ্ধ ফসল।

বারি ঢেমশী-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

চাষ পদ্ধতি: জমিতে ভালভাবে চাষ দিয়ে ২-৩ সেমি গভীরে সারিতে বপন করতে হয়। বপন করার পর আলগা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বীজ গজানোর ১২-১৫ দিন পর চারা পাতলা করে দিতে হয়। সাধারণত ১-২ টি সেচের প্রয়োজন হয়।

বীজের হার: ৭-৮ কেজি/হেক্টর।

রোপণ দূরত্ব: সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেমি,গাছ থকে গাছের দূরত্ব ৮-১০ সেমি।

প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা: ৪,০০০০০ (চার লক্ষ) ।

সার ব্যবস্থাপনা: বীজ বপনের এক মাস আগে ৫-১০ টন ভালভাবে পচানো জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

রাসায়নিক সার	পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)
ইউরিয়া	১৩০ কেজি
টিএসপি	২০ কেজি
মিউরেট অব পটাশ	৪০ কেজি

টিএসপি ও মিউরেট অব পটাশ এর সম্পূর্ণ ডোজ এবং ইউরিয়া -এর অর্ধেক ডোজ বপনের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া -এর অবশিষ্ট অর্ধেক ডোজ আর্দ্রতার প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে দুই থেকে তিন ভাগে (বপনের ৩০ এবং ৫০ দিন পরে) প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার: ঢেমশীর সম্পূর্ণ দানা খাওয়া যায়। বীজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে আটা করে বিভিন্ন খাবার যেমন কেক, বিস্কুট, রুটি তৈরি করে খাওয়া যায়। এছাড়াও কচি কাণ্ড, পাতা শাক হিসেবে খাওয়া যায়। অন্যদিকে ঢেমশীতে মূল্যবান ওষধিগুণ থাকায় তা ঔষধশিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসলের ব্যবহারে যোগ্য অংশের নাম: বীজ এবং কচি কাণ্ড ও পাতা।

রোগ, পোকা-মাকড় ও প্রতিকার: গবেষণাকালে নির্বাচিত লাইনটিতে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় নাই।

নেগি অনিয়নের জাত

বারি নেগি অনিয়ন-১

সাধারণ পেঁয়াজ (Onion, *Allium cepa* L.)-র মত নেগি অনিয়নে কন্দ (Bulb) উৎপাদন হয় না। এর গঠন অসাধারণ। নেগি পেঁয়াজের গাছ সবুজ পত্রফলক (Leaf blade), পাতার শিথ (Leaf sheath) এবং স্টেম প্লেট (Stem plate) দ্বারা গঠিত। স্টেম প্লেট থেকে শিকড় গজায়। মজার ব্যাপার হলো, এ প্রজাতির গাছে পাতার শিথগুলো (পত্রফলকের নিচের অংশ) পরপর আচ্ছাদিত হয়ে একটি লম্বা ও মোটা সাদা সিউডোস্টেম (Pseudostem) উৎপন্ন হয়। অন্যান্য দেশে খাটো সিউডোস্টেমের নেগি অনিয়নও পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, জাপানি ভাষায় Negi শব্দের Ne অর্থ শিকড় (root) এবং gi অর্থ পেঁয়াজ (onion)। সিউডোস্টেমের চেহারা দেখতে শিকড়ের মতো, তাই একে নেগি অনিয়ন বলা হয়। সিউডোস্টেমের গঠন নরম ও রসালো (Succulent) হয়। মূল বাদে সিউডোস্টেম ও পাতা এর ভক্ষণযোগ্য অংশ। এর স্বাদ (Flavour), সুগন্ধ (Aroma) ও ঝাল (Pungency) সাধারণ পেঁয়াজের মত, বিধায় নেগি অনিয়ন পেঁয়াজের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যা খাওয়ার জন্য খুবই উপাদেয়। সাধারণত গাছে ফুল আসার পূর্ব পর্যন্ত সিউডোস্টেম খাওয়া হয়। গাছে ফুল দণ্ড উৎপন্ন হওয়ার পরে সাদা সিউডোস্টেম তুলনামূলকভাবে শক্ত হয়ে যায়। নেগির পাতা ও ফুল দণ্ড (Scape/flowering stalk) ফাঁপা (Hollow) থাকে। এর ফুল দণ্ডও পাতার মত। সাধারণ পেঁয়াজের পাতার তুলনায় এর পাতা খুবই বড়, নলাকার ও গাঢ় সবুজ হয়ে থাকে। নেগি অনিয়নের পাতার আকৃতি প্রায় গোলাকার, তাই এর পাতার প্রস্থচ্ছেদ (Cross section) দেখতে "O" (গোলাকার) আকৃতির। কিন্তু সাধারণ পেঁয়াজ পাতার এর গাছের দিকের অংশ সমান (Flat) এবং অন্য তিন দিকের অংশ

বারি নেগি অনিয়ন-১ গাছ

বারি নেগি অনিয়ন-১ বীজের মাঠ

বারি নেগি অনিয়ন-১ এর কদম

গোলাকার, তাই এর পাতার প্রস্থচ্ছেদ দেখতে "D" আকৃতির। এ প্রজাতির পেঁয়াজের গাছের উচ্চতা ৭০-৭৫ সেমি এবং প্রতিটি সাদা সিউডোস্টেমের দৈর্ঘ্য ও ওজন যথাক্রমে ২৫-৩০ সেমি ও ৮০-১০০ গ্রাম হয়ে থাকে। এ ফসলটিতে শুধুমাত্র বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে গাছে ফুল ধরা শুরু হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: নেগি অনিয়ন বিস্তৃত জলবায়ু এবং পরিবেশগত পরিস্থিতির সাথে ভালভাবে অভিযোজিত। তাই এ প্রজাতিটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল এবং উষ্ণ/অব-উষ্ণ অঞ্চলে জন্মাতে পারে। রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গায় ভাল নিষ্কাশনযুক্ত এঁটেল-দোআঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ এবং ৫.৭-৭.৫ p^H মাটিতে এ ফসল সুন্দরভাবে জন্মে থাকে। তবে গাছের বৃদ্ধির জন্য ১৫-২২°C তাপমাত্রা উত্তম। এ প্রজাতিটি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

জমি তৈরি: কমপক্ষে ২৫-৩০ সেমি গভীর পর্যন্ত জমিতে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করা হয়। শিকড়ে নেমাটোডের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মূল জমি তৈরির সময় প্রতি বিঘা জমিতে ৪ কেজি (৯ গ্রাম/৩ বর্গ মিটার, ৩০ কেজি/হেক্টর) রাগবী ৫ জি প্রয়োগ করতে হবে। আগাছাসহ অন্যান্য আবর্জনা ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে। পরে জমিতে ১ মিটার চওড়া এবং ৩ মিটার দৈর্ঘ্য (আদর্শ বেডের পরিমাপ) অথবা সুবিধামত দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে অনেকগুলো উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। একটি বেড থেকে অন্য বেডের মাঝখানে কমপক্ষে ৫০ সেমি নালার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে পানি নিষ্কাশন ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যার কার্যক্রম সহজ হয়। নালার মাটি বেডের উপর দিতে হবে যাতে বেড উঁচু হয়। প্রয়োজন মত জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া ছাদ বাগান, বিভিন্ন পাত্র (Containers), বসতভিটাসহ বিভিন্ন পতিত জায়গায় চাষ করা যায়। তাছাড়া ছাদ বাগান, বিভিন্ন পাত্র (Containers), বসতভিটাসহ বিভিন্ন পতিত জায়গায় চাষ করা যায়। নেগি অনিয়ন জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় বর্ষা মৌসুমে উপরোল্লিখিত জায়গাসহ নিষ্কাশন যোগ্য যে কোন উচুঁ স্থানে উৎপাদনের জন্য উপযোগী।

অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত নেগি অনিয়ন

বীজ বপন: নেগি অনিয়ন বাংলাদেশে সারাবছর চাষযোগ্য, তাই যে কোনো মাসে এর বীজ বপন করা যায়। তবে মধ্য জুলাই (শ্রাবণের প্রথম) মাস থেকে বীজ বপন শুরু করলে এর ফলন বেশি হয়। রোপণ দূরত্ব ২০ সেমি × ২০ সেমি বজায় রেখে নেগি অনিয়ন উৎপাদন করলে প্রতি বিঘা জমিতে ৪০০-৫৩৫ গ্রাম (১ গ্রাম/৩ বর্গ মিটার, ৩-৪ কেজি/হেক্টর) বীজের প্রয়োজন হয়। বপনের পূর্বে বীজ প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি বা অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউডিজি ছত্রাকনাশকের (প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫ গ্রাম ছত্রাকনাশক) মাধ্যমে শোধন করা ভাল।

চারা রোপণ: বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর চারা উত্তোলন করে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। নেগি অনিয়নের উচ্চতা বেশি হওয়ায় প্রস্তুতকৃত জমিতে তুলনামূলকভাবে মাটির গভীরে চারা রোপণ করা হয়ে থাকে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি বজায় রেখে প্রতি সারিতে ২০ সেমি পরপর চারা রোপণ করা হয়। প্রতি ৩ বর্গ মিটার বেডের জন্য ৭৫ টি চারার প্রয়োজন হয়। রোপণের পূর্বে চারার গোড়া রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি দ্রবনে (২ গ্রাম/লিটার পানি) শোধন করতে হবে। চারার উচ্চতা বেশি হলে ডগা থেকে কিছু অংশ কেঁটে দেওয়া উচিৎ, তাতে চারা সহজেই মাঠে প্রতিষ্ঠিত হবে।

সার ব্যবস্থাপনা: নেগি অনিয়নে কন্দ হয় না, তাই এ ফসলের জমিতে ফসফরাস সার কম প্রয়োজন। স্যিউডোস্টেম ও পাতার বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন সার তুলনামূলক বেশি দরকার হয়। জমির অবস্থা বুঝে সারের মাত্রা কম-বেশী হয়ে থাকে। এ ফসলের জমিতে বিঘা প্রতি ৪০০-৬৫০ কেজি পচা গোবর সার, ৩০-৩৩ কেজি ইউরিয়া, ১৬-২০ কেজি টিএসপি, ২০-২৩ কেজি এমওপি, ১৬-২০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করতে হয়। সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম এবং এক চতুর্থাংশ ইউরিয়া জমি তৈরির সময় দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া উৎপাদন মৌসুমে তিন কিস্তিতে সমান ভাবে চারা রোপণের ২৫-৩০, ৫০-৬০ এবং ৮০-৯০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

আন্তঃপরিচর্যা: নেগি অনিয়নে সময়মত আগাছা নিড়াতে হবে ও পানি সেচ দিতে হবে। গাছের উচ্চতা বেশি হওয়ার কারণে রোপণের এক মাস পর থেকে মাঝে মাঝে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

নেগি অনিয়ন সংগ্রহ ও ফলন: বীজ বপন সময়ের উপর নেগি অনিয়নের জীবনকাল নির্ভর করে। জুলাই (শ্রাবণের প্রথম) মাসে বীজ বপন করলে এ ফসলের জীবনকাল ২৬০-২৭০ দিন (বীজ হতে বীজ সংগ্রহ) হয়। এ মাসে বীজ বপন করলে ১০০-১৮০ দিনের মধ্যে যে কোনো সময়ই সিউডোস্টেম সংগ্রহ করা যায়। এ সময় সিউডোস্টেমের গঠন নরম ও রসালো (Succulent) হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি

মাসে গাছে ফুল ধরা শুরু হলে সিউডোস্টেম তুলনামূলকভাবে কিছুটা শক্ত হয়ে। হাত দিয়ে সম্পূর্ণ গাছটি সংগ্রহের পর এর থেকে মূল এবং পুরাতন পাতাসহ পাতার শিথ (পত্রফলকের নিচের অংশ) ফেলে দিয়ে ২-৩ টি নেগি অনিয়ন (সিউডোস্টেমসহ পাতা) লম্বা পলিথিন মোড়কের মধ্যে ঢুকিয়ে বাজারজাত করলে নেগি অনিয়ন তাজা থাকে। নেগি অনিয়নের (সিউডোস্টেম) ফলন বিঘা প্রতি ২.৫-৩.৩ মে. টন (২০-২৫ মে. টন/হেক্টর)। নেগি অনিয়ন পলিথনির ভিতরে ঢুকিয়ে এক মাস পর্যন্ত রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা যায়। বীজের ফলন প্রতি হেক্টরে ১৫০-১৭০ কেজি। বীজের ফলন রোপণ দূরত্ব, প্রতি গোছায় ফুল দণ্ডের সংখ্যা এবং অন্যান¨ পরিচর্যার উপর ভিত্তি করে কম-বেশি হতে পারে। নেগি অনিয়নের ১০০০ টি বীজের ওজন ২.০০-২.৫০ গ্রাম।

কিনোয়ার জাত

বারি কিনোয়া-১

কিনোয়া গাছের গড় উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেমি। জাতটির মঞ্জুরী খাড়া ও ৮-৯টি করে শাখা (branch) আছে। জাতটি প্রতি হেক্টরে ১.৮ টন পর্যন্ত ফলন দেয়। দানা গোলাকার, চ্যাপ্টা ও হালকা বাদামী বর্ণের। হাজার দানার ওজন ৩.৪ গ্রাম। ফসলের জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন। জাতটি লবণাক্ততা সহনশীল (১২ ডিএস/মি)। হেলে পড়ার প্রবণতা কম । তাই ঝড়-বাতাসে সহজে ভেঙ্গে পড়েনা এবং জাতটিতে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না। তবে বেশী পরিপক্ক হলে বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে।

বারি কিনোয়া-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমিতে ভালভাবে চাষ দিয়ে ২-৩ সেমি গভীরে সারিতে বপন করতে হবে। বপন করার পর আলগা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ গজানোর ১২-১৫ দিন পর চারা

পাতলা করে দিতে হবে। কুশি ও ফুল বের হওয়ার সময় বৃষ্টিহীন থাকলে সেচের প্রয়োজন হয়। তবে, দীর্ঘ দিন বৃষ্টিহীন থাকলে ভাল ফলন পেতে হলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণত ২-৩ টি সেচের প্রয়োজন হয়। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজের হার: হেক্টর প্রতি ৭-৮ কেজি বীজের প্রয়োজন।

বপন দূরত: সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সিমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭ সেমি।

সার ব্যবস্থাপনা

রাসায়নিক সার	পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)
ইউরিয়া	১২০ কেজি
টিএসপি	১৫০ কেজি
মিউরেট অব পটাশ	৪০ কেজি

যে সমস্ত জমিতে বোরণ ও জিংকের ঘাটতি আছে সেসব জমিতে কাঙ্খিত ফলন পাওয়ার জন্য প্রতি হেক্টরে ৫ কেজি হারে বরিক এসিড ও জিংক সালফেট প্রয়োগ করত হবে।

সাধারণত মিউরেট অব পটাশ ও টিএসপি সার ১/৩ অংশ ইউরিয়ার সাথে মিশ্রিত করে জমি তৈরির সময় ব্যাসাল ডোজ (basal dose) হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। বাকি ইউরিয়া ২ বারে ভেজিটেটিভ গ্রোথ (vegetative growth) ও টিলারিং অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। রেইনফেড (rainfed) অবস্থায় চাষাবাদ করলে সকল সার ব্যাসাল ডোজ (basal dose) হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

ফসলের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার: বীজ স্যাপোনিন (Saponin) যুক্ত। দুই ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে স্যাপোনিন দূরীভূত হয়। পরবর্তীতে শুকিয়ে নিতে হয়। কিনোয়া থেকে সহজেই ভাত, খিচুড়ী ইত্যাদি রান্না করা যায়। তাছাড়া কিনোয়া মিলিং করে আটা তৈরি করা যায়, যা থেকে বিস্কুটসহ বিভিন্ন ধরনের বেকারী খাদ্য তৈরি করা যায়।

রোগ, পোকা-মাকড় ও প্রতিকার: গবেষণাকালে জাতটিতে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রযুক্তি: লিলিয়াম ফুলের সংগ্রহোত্তর সংরক্ষণ

বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে ফুলের চাহিদা রয়েছে। লিলিয়াম একটি আকর্ষণীয় ফুল হলেও এর সংগ্রহ ও সরবরাহে পর্যাপ্ত সর্তকতা অবলম্বন না করলে এ ফুলের সকল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। ফুলটি আকারে বেশ বড়, প্রসারিত, পাপড়িগুলো ছড়ানো ও ভঙ্গুর হওয়ায় ফুলটি কুঁড়ি অবস্থায় সংগ্রহ না করলে ফোটার পর তা পরিবহন করা যায় না। বিভিন্ন উৎসব ও আয়োজনকে সামনে রেখে সঠিক সময়ে সংগ্রহ করে লিলিয়াম ফুল বাজারজাত করা গেলে চাষীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন আর ক্রেতারাও লিলিয়ামের অপরূপ সৌন্দর্য ও বর্ণ দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করতে পারবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: বারি লিলিয়াম-১ ফুলের স্টিক প্রথম দুইটি কুঁড়িতে রং আসলেই মাটি থেকে ০৫ ইঞ্চি উপরে কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এরপর ২০ মিনিট স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে পালসিং করে তুলে নিচের ৫-৭ সেমি স্থানের পাতা সাবধানে অপসারণ করতে হবে, এতে ফুলের প্রস্বেদন কমে যাবে। এরপর স্টিকগুলোকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮০-৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ছিদ্রবিহীন এলডিইপি (লো ডেনসিটি পলিইথিলিন) প্যাকেটে সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে ১-২ দিন সংরক্ষিত লিলিয়াম ফুলের স্টিক ফুলদানিতে ৭-৮ দিন পর্যন্ত সতেজ, উজ্জ্বল থাকে।

উপযোগি এলাকা: সারাদেশের ফুল উৎপাদন এলাকা (ফুল চাষী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা)

প্রযুক্তির উপযোগিতা: এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন উৎসব পার্বণ ছাড়াও অবিক্রিত ফুল বেশিদিন সংরক্ষণ করে বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: উপযুক্ত পরিপক্ক অবস্থার ফুল সংগ্রহ না করে মাঠে রেখে দিলে সেগুলি তাড়াতাড়ি ফুটে যায় এবং জীবনকাল শেষ হয়ে যায়। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে লিলিয়াম ফুলের সংরক্ষণকাল ও ভেজলাইফ উভয়ই বাড়ানো যায়।

প্রযুক্তি হতে ফলন/ প্রাপ্তি: এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন উৎসব পার্বণ ছাড়াও অবিক্রিত ফুল বেশিদিন বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রযুক্তির প্রভাব: মাঠ লেভেলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একদিকে যেমন কৃষক ও ফুল ব্যবসায়ি লিলিয়াম ফুল বাজারজাতকরণের যথেষ্ট সময় পাবেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হবেন অন্যদিকে তেমনি ফুল প্রেমিরা ৭-৮ দিন পর্যন্ত ঘরের ফুলদানীতে এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন।

৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৮০-৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ছিদ্রবিহীন এলডিইপি (লো ডেনসিটি পলিইথিলিন) প্যাকেটে সংরক্ষিত লিলিয়াম ফুল।

প্রযুক্তি: স্বল্প খরচে ইথিলিন জেনারেটরের সাহায্যে বাণিজ্যিকভাবে কলা পাকানোর নিরাপদ কৌশল

শারীরতাত্ত্বিকভাবে ফলের বৃদ্ধি ও বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে মূলত ফল পেকে থাকে। আবার গাছের সকল ফল একসাথে পাকেও না। এসব ফল পাকার জন্য অপেক্ষা না করে পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করা হয় এবং খুচরা বিক্রির আগে অনুমোদিত পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে পাকাতে বাধা নেই। পরিপক্ক ফলের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিকভাবেই ইথিলিন নামক হরমোন তৈরি হয়, যা ফল পাকাতে সাহায্য করে। নিয়ন্ত্রিত চেম্বারে কৃত্রিমভাবে অনুমোদিত মাত্রায় ইথিলিন গ্যাস প্রয়োগে পরিপক্ক ফল পাকানো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয় না এমন পদ্ধতিতে ইথিলিন প্রয়োগে ফল পাকানো সুপারিশযোগ্য। পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি শাখায় এমনই এক পদ্ধতিতে কলা পাকানোর উপর গবেষণা করা হয়েছে এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: ইথিলিন জেনারেটর তৈরিকরণ: বাণিজ্যিকভাবে ফল পাকানোর জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার ইথোফোন (২-ক্লোরোইথাইলফসফোনিক অ্যাসিড) দ্রবণ তৈরি করে নিতে হবে। এজন্য ঢাকনাযুক্ত একটি ছোট পাত্রে বা বালতিতে ০১

লিটার পানি নিয়ে তাতে ০.৫ মিলিলিটার ইথোফোন (৪৮% সক্রিয় উপাদান) মিশিয়ে নিলে ২৫০ পিপিএম এর ইথোফোন দ্রবণ তৈরি হবে। এরপর ছিদ্রযুক্ত মুখাসহ একটি ছোট প্লাস্টিকের পাত্রে কিছু তুলা দিয়ে তাতে তৈরিকৃত ইথোফোন দ্রবণের ০৫ মিলি ও ০৫ মিলি পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (৩৯%) ঢেলে দিয়ে বোতলের ঢাকনা বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত ঘনমাত্রার ইথিলিন জেনারেটর তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই বোতল থেকে ইথিলিন গ্যাস তৈরি হয়ে মুখার ছিদ্রপথ দিয়ে সহজেই নির্গত হবে, যা আম, কলা, টমেটো ইত্যাদি ফল নিরাপদে পাকানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি:

- গাছ থেকে উপযুক্ত পরিপক্কতার পর্যায়ে কলার কাঁদি সংগ্রহ করে এর ফানাগুলো (Hand) আলাদা করে নিতে হবে। তবে আস্তা কাঁদিসহও কলা পাকানো যেতে পারে।
- কলাগুলো ২০০ পিপিএম সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (প্রতি লিটার পানিতে ৩.৫ মিলি. ক্লোরক্স) দ্বারা ধৌত করতে হবে।
- পানি ঝরিয়ে কলাগুলো প্লাস্টিক ক্রেটে সাজিয়ে তাতে ২৫০ পিপিএম ঘনমাত্রার একটি ইথিলিন জেনাটেরের ছোট বোতল বসিয়ে দিয়ে পলিথিন দিয়ে উপরে ঢেকে দিতে হবে।
- অন্যদিকে ৩-৪ টি আস্ত কলার কাঁদি একটি এক ঘনমিটার আকারের পলিথিন ব্যাগের নিচে রেখে সেখানে ২৫০ পিপিএম ঘণমাত্রার একটি ইথিলিন জেনাটের রেখে দিতে হবে। এক্ষেত্রে পলিথিলিনের ব্যাগটি চতুর্দিকে ভালভাবে গুজে দিতে হবে যাতে উৎপাদিত ইথিলিন গ্যাস লিক হতে না পারে।
- ২৪ ঘণ্টা পর পলিথিন সরিয়ে কলাগুলো উন্মুক্ত করে রাখতে হবে। এতে পরবর্তী ১-২ দিনের মধ্যে কলাগুলো পেকে খাবার উপযোগী হয়ে যাবে।

উপযোগী এলাকা: সারাদেশ (কলা পাকানোর চেম্বার কিংবা ফলের আড়ৎ)

প্রযুক্তির উপযোগিতা: নিরাপদে কলা পাকানোর জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে। সবরি জাতের কলা পরিপক্ক-সবুজ স্টেজে সংগ্রহ করে কক্ষ তাপমাত্রায় ২৫০ পিপিএম ঘনমাত্রার ইথিলিন জেনারেটর সহ ২৪ ঘণ্টা আবদ্ধ রাখার পর খুলে দিলে কলাগুলো উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ধারণসহ দু'দিনেই সুষমভাবে পাকে এবং বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়ে যায়।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষক ও ব্যবসায়িরা গাছে থাকা অবস্থায় কিংবা গাছ থেকে সংগ্রহের পর কলায় মাত্রাতিরিক্ত ইথোফোন দ্রবণ

স্প্রে করা কিংবা ইথোফোন মিশ্রিত পানিতে কলা ডুবিয়ে পাকানোর ব্যবস্থা করে থাকেন, যা বিজ্ঞানসম্মত নয় এমনকি স্বাস্থ্যসম্মতও নয়। কাজেই এই প্রযুক্তি ব্যহারের মাধ্যমে নিরাপদ উপায়ে কলা পাকিয়ে বাজারজাত করলে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন, অন্যদিকে তেমনি ভোক্তগণ স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ কলা খেতে পারবেন।

প্রযুক্তির প্রভাব: এই প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অনৈতিকভাবে ফল পাকানোর প্রবণতা কমবে এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমে আসবে।

১। ইথিলিন জেনারেটর তৈরিকরণ, ২। পলিথিনের আচ্ছাদনের ভেতর ইথিলিন জেনারেটর সহ পাকানোর জন্য রক্ষিত কলা, ৩। ইথিলিন জেনারেটর ব্যবহার করে পাকানো কলা (ট্রিটমেন্টের ২য় দিন)।

প্রযুক্তি: আন্তঃফসল হিসেবে বারি বেগুন-১২ এর সাথে মুড়ি কাটা পেঁয়াজ চাষ

উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বেগুনের সাথে পেঁয়াজের চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বেগুন চাষ করতে লম্বা সময়ের দরকার, প্রায় ২১০-২৩০ দিন এবং এর স্পেসিং অনেক বেশী (১০০ সেমি × ৭৫ সেমি)। তাই ২ লাইন বেগুনের মধ্যে পেঁয়াজ এর মতো অল্প ক্যানোপীর ফসল চাষ করা যায়। এতে করে দেশে পেঁয়াজের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কৃষকের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- একই জমিতে একই সাথে ২ টা ফসল করা যায়।
- ২ সারি বেগুনের মাঝে ৫, ৪ বা ৩ সারি মুড়ি কাটা পেঁয়াজ রোপণ করতে হবে।
- অক্টোবর মাসে বেগুনের চারা ও পেঁয়াজ গুটি রোপণ করতে হবে।
- বেগুনের জন্য স্পেসিং : ১০০ সেমি × ৭৫ সেমি।
- পেঁয়াজের জন্য স্পেসিং : ১০ সেমি × ১৫ সেমি।

উপযোগিতা: বাংলাদেশের সকল স্থানে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই জমিতে একই সাথে ২ টা ফসল করা যায়।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: বারি বেগুন-১২ এর সাথে মুড়ি কাটা পেঁয়াজ চাষাবাদের ফলে বিসিআর প্রায় ৪.০০ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। ছোট চাষিরা অল্প জমিতে ২ টা ফসল উৎপাদন করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে লাভবান হবেন। এতে পুষ্টির চাহিদাও পুরণ হবে।

চিত্র: বারি বেগুন-১২ এর ২ সারির মধ্যে ৫ সারি পেঁয়াজের লাইন

চিত্র: বারি বেগুন-১২ এর ২ সারির মধ্যে ৪ সারি পেঁয়াজের লাইন

চিত্র: বারি বেগুন-১২ এর ২ সারির মধ্যে ৩ সারি পেঁয়াজের লাইন

প্রযুক্তি: উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় বারি সরিষা-১৮ এর উৎপাদন কলাকৌশল

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় বারি সরিষা-১৮ এর বীজ অক্টোবর মাসের শেষ থেকে নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে বপন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করলে অধিক ফলন ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: বরেন্দ্র অঞ্চলে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁসহ যেসব এলাকায় দেরিতে বোরো ধান রোপণ করা হয় অথবা মৌসুমী পতিত জমি থাকে সেকল এলাকা এ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।

প্রযুক্তির ব্যবহারের তথ্য: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি সরিষা-১৮ একটি স্বাস্থ্যসম্মত ও ক্যানোলামান সম্পন্ন জাত। এটির জীবনকাল কিছুটা দীর্ঘ (১০০-১০৫ দিন) হওয়ায় দেশের প্রধান ফসলধারায় যুক্ত করা অনেক জেলাতেই কিছুটা কষ্টকর হয়েছে। তবে বরেন্দ্র এলাকায় সরিষা চাষের পর কিছুটা দেরিতে (ফেব্রুয়ারি) বোরো ধান রোপণ করায় এ অঞ্চলে বারি সরিষা-১৮ সফলভাবে চাষ করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে যেসব জমিতে আউস ধান চাষ করা হয় সেখানে পরিবর্তিতে এই জাতটি সফলভাবে চাষ করা যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় বারি সরিষা-১৮ এর বীজ অক্টোবর মাসের শেষ থেকে নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে বপন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা করলে অধিক ফলন ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

বীজ বপন: অক্টোবর মাসের শেষ থেকে নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে জমিতে বীজ বপন।

অন্যান্য ব্যবস্থাপনা: যেহেতু বারি সরিষা-১৮ জাতটি অধিক ফলনশীল তাই এটি চাষাবাদে সারের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি (বিঘাপ্রতি ইউরিয়া ৩০ কেজি, টিএসপি ২০ কেজি, এমওপি ১৫ কেজি, জিপসাম ২০ কেজি, বোরন ১.৫ কেজি ও দস্তা ১ কেজি)। বীজ বপনের পর পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা করতে হবে। বরেন্দ্র এলাকার মাটি কর্দম বুনটের হওয়ায় সর্তকর্তার সাথে ২৫-৩০ দিনের মধ্যে পানি সেচ দিতে হবে, যাতে কোন অবস্থাতেই জমিতে পানি জমে না থাকে। বীজ গজানের ১৫-২০ দিন এর মধ্যে প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৬০ টি গাছ রেখে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। ফুল ঝরে যাওয়ার পর শুটি পর্যায়ে অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দমনের জন্য রোভরাল ২ গ্রাম হারে ও জাব পোকা দমনের জন্য টাফগর ১ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। সরিষা গাছের ফল ৭০-৮০% হলুদাভ বর্ণ ধারণ করলে সকালের দিকে ফসল কর্তন করতে হবে। দুপুরের প্রখর রোদে কাটলে সরিষার বীজ ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রযুক্তি হতে ফলন: প্রতি বিঘায় ফলন ৩০০-৩৪০ কেজি পাওয়া যায়। এতে মোট আয় হয় ২৫০০০-২৮০০০/- টাকা। প্রতি বিঘায় ৯৫০০-১০০০০/-টাকা খরচ হলে নিট আয় হয় ১৫০০০-১৮০০০/- টাকা। প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় বারি সরিষা-১৮ চাষ করা যায় ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় বারি সরিষা-১৮ এর উৎপাদন কলাকৌশল

প্রযুক্তির প্রভাব: বারি সরিষা-১৮ জাতের তেলে ইরুসিক এসিড (১.০৬%) এর পরিমাণ কম থাকায় স্বাস্থ্যের জন্য কোন ক্ষতিকর প্রভাব নাই। অধিকন্তু এতে অত্যাবশকীয় অ্যামাইনো এসিড যেমন, লিনোলিক এসিড, লিনোলিনিক এসিড ও ওলিক এসিড বেশি থাকায় এটি শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। জাতটি অপেক্ষাকৃত লম্বা প্রকৃতির হওয়ায় এর খড় পারিবারিক জ্বালানির চাহিদা মেটায়। এছাড়া এটি চাষে পানির পরিমাণ কম লাগে যা বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশের জন্য উপযোগী।

প্রযুক্তি: চলনবিল এলাকায় কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রচলিত পাট-রসুন ফসল ধারার উন্নয়ন

বিল এলাকা বছরের অধিকাংশ সময় পানির কারণে পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে বিধায় কম উৎপাদনশীল। তবে প্রতি বছর বিল এলাকায় জমি পানিতে নিমজ্জিত থাকার কারণে পলি পড়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। উক্ত এলাকার কিছু কিছু স্থানে প্রধান ফসল ধারা হিসাবে রসুন-পাট আবাদ করে থাকে। পাটশাক বাংলাদেশের খরিফ মৌসুমের পাতা জাতীয় সবজির মধ্যে অন্যতম। পাট পাতার সবজি এবং ঔষধি মূল্য উভয়ই রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই, রোগ নিরাময়ের জন্য ভেষজ ঔষধ হিসাবে পাট পাতা ব্যবহার করা হচ্ছে। রসুনের মূলত স্থানীয় জাত ব্যবহার করা হয়। যার ফলন তুলনামুলকভাবে কম বিধায় উন্নত নতুন জাত ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চলনবিল এলাকায় ফসলের উৎপাদনশীল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় রসুনের জাতের পরিবর্তে কৃষি গবেষণা উদ্ভাবিত রসুনের জাত চাষের মাধ্যমে ফসল ধারার উন্নয়ন করা সম্ভব। এতে কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

ফসল: রসুন ও পাট

জাত ও বীজের হার: রসুনের জন্য বারি রসুন-৩/ রসুন-৪ এবং পাটের জন্য ইন্ডিয়ান তোষা ব্যবহার করতে হবে। বীজ হার রসুন ও পাটের জন্য যথাক্রমে হেক্টর প্রতি ৪০০ কেজি এবং ৬ কেজি। রসুন নভেম্বরের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহে এবং পাট এপ্রিল এর ১ম সপ্তাহে রোপণ করতে হবে।

বপন/রোপণ দূরত্ব: রসুনের জন্য ১৫ সেমি × ৮ সেমি এবং পাট ছিটিয়ে বোনা।

সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর): রসুন: হেক্টর প্রতি ১০০ - ১৫২ - ১৬৫ - ২০ - ৪ কেজি হারে ইউরিয়া-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম- জিংক সালফেট দিতে হবে।

পাট: হেক্টর প্রতি ১১০ - ১৫ - ৭৫ - ২৭ - ৪ কেজি হারে ইউরিয়া-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম- জিংক সালফেট দিতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি:

রসুন: রসুনে ইউরিয়া সারের তিন ভাগের এক ভাগ এবং অন্যান্য সকল সার জমি শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুই ভাগে রোপনের ৩০ ও ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

পাট: পাটের ক্ষেত্রে অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার জমি শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া বপনের ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ:

রসুন: রসুন বপনের ৪৫, ৬৫, ৮৫ ও ১০৫ দিন পর মোট চার বার সেচ দেয়া প্রয়োজন।

পাট: বপনের সময় এবং বপনের ১৫ দিন পর মোট ২ বার অবশ্যই সেচ দিতে হবে। বৃষ্টি হলে পরবর্তিতে আর সেচের প্রয়োজন হয় না।

আগাছা দমন:

রসুন: বপনের ১ দিন পূর্বে পেন্ডিমিথিলিন গ্রুপের আগাছানাশক প্রয়োগ করে বপনের পর খড়ের মালচ দিয়ে দেয়া হয় এবং বপনের পরে মোট ২ বার হাত দিয়ে আগাছা তুলে দিয়ে দমন করা হয়।

পাট: পাটে ২য় সেচের সময় অর্থাৎ বপনের ১৫ দিন পরে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

রোগবালাই ও পোকামাকড়

রোগবালাই: রসুনে সাধারনত বাইট, সফট রট, ড্যাম্পিং অফ, ডাউনি মিলডিউ এবং পাতা ঝলসানো রোগ হয়। এসব রোগ দমনের জন্য ডাইথেন এম-৪৫/রোভরাল ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করে দমন করা যায়।

পোকামাকড়: রসুন সাধারনত থ্রিপস/চুঙ্গি পোকা, রেড স্পাইডার ও মাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়। এসব পোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন/ডেইমেক্রন/জেসিড প্রতি লিটার পানিতে ১মিলি হারে স্প্রে করে দমন করা যায়। পাটে লেদা পোকার আক্রমণ হলে ভিট্রাকো প্রয়োগ করে দমন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: **রসুন** (রসুন মার্চের শেষ সপ্তাহ), **পাট** (জুলাই এর মাঝামাঝি)।

ফলন: **রসুন** (১২.০-১৩.৮ টন/হেক্টর), **পাট** (২.১-২.২ টন/হেক্টর)।

আয় - ব্যয়

ফসলধারা	মোট আয় (টাকা/হেক্টর)	মোট উৎপাদন খরচ (টাকা/হেক্টর)	নীট মুনাফা (টাকা/হেক্টর)	আয় ও খরচের অনুপাত
বারি রসুন-৩-পাট ফসলধারা	৮২০৮০০	২২৭৩২৫	৫৯৩৪৭৫	৩.৬১
বারি রসুন -৪-পাট ফসলধারা	৭৫৬৮০০	২২৭৩২৫	৫২৯৪৭৫	৩.৩৩
ইটালি রসুন -পাট ফসলধারা	৬৫৯২০০	২২৭৩২৫	৪৩১৮৭৫	২.৮৯

উপযোগিতা: বিল এলাকা।

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট

- বাংলাদেশের বিল এলাকায় শুধুমাত্র বোরো ধানের আবাদ করা হয়।
- বোরো ধানের বিকল্প হিসেবে অন্যান্য ফসল আবাদ করলে দেশের পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়ক হবে। বোরো ধানের পূর্বে স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল রসুনের জাত আবাদ করলে রসুন-পাট ফসল ধারার উন্নয়ন হবে।
- স্থানীয় রসুনের জাতের পরিবর্তে কৃষি গবেষণা উদ্ভাবিত রসুনের জাত চাষের মাধ্যমে ফসল ধারার উন্নয়ন করা সম্ভব।
- এতে কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। বোরো ধানের তুলনায় রসুনের কম পানির প্রয়োজন হয়। তাই ভূগর্ভস্থ পানির স্বল্প ব্যবহার বা স্বদ্য ব্যবহারের মাধ্যমে চলনবিল/বিল এলাকায় কৃষিতাত্ত্বিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বারি রসুন-৩

বারি রসুন-৪

পাট

প্রযুক্তি: চিয়া চাষে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা

চিয়া (Salvia hispanica L.) একটি ভেষজগুণ ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফসল। চিয়ার আদি বাসস্থান মেক্সিকো ও গুয়াতিমালা। প্রচলিত বিভিন্ন দানাজাতীয় ফসল যেমন ধান, গম, ভুট্টা, ওট ও বার্লির তুলনায় চিয়া বীজে প্রোটিন, লিপিড ও শর্করার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি বলে সাম্প্রতিক সময়ে চিয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিয়ার গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ চিয়ার বিভিন্ন কৃষিতাত্ত্বিক ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। বিগত তিন বছরের (২০২০-২০২২) চিয়ার কৃষিতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় আমাদের দেশের আবহাওয়ায় চিয়া ভাল ফলন দেয় ও ফসলটি অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক।

প্রযুক্তির বিবরণ

ফসল: চিয়া

জাত ও বীজের হার: বারি চিয়া-১ চিয়া বীজ বপনের জন্য হেক্টরপ্রতি ৪.৫-৫কেজি বীজের প্রয়োজন।

বপন/রোপণ সময়: চিয়া বীজ ০১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর বপন করলে ভালো ফলন দেয়। তবে পুরো নভেম্বর মাস বপন করা যায়। বীজ বপনের ১০৫ দিন থেকে ১১০দিন পর ফসল সংগ্রহ করা যায়।

বপন দূরত্ব: ছিটিয়ে ও সারি উভয় পদ্ধতিতেই বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে আন্তঃপরিচর্যা করতে সহজ হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি।

সারের বর্ণনা (কেজি/হেক্টর): ইউরিয়া ১৩০, টিএসপি ২০০, এমওপি ১০০, জিপসাম ৪৫ ও গোবর সার ৫০০।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার বপনের ৩০ দিনের মধ্যে সারিতে পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে।

বপন দূরত্ব ও বপন পদ্ধতি: ছিটিয়ে ও সারি উভয় পদ্ধতিতেই বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে আন্তঃপরিচর্যা করতে সহজ হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: জমিতে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিলে মাটিতে শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয়।

সেচ প্রয়োগ: ২-৩ টি হালকা সেচের প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর ১ম এবং ৫০-৫৫ দিন পর ২য় সেচ (গাছে ফুল আসার সময়) দিতে হবে। প্রতি সেচে খুব অল্প পরিমাণ পানি প্রয়োগ করতে হবে। তবে চিয়া বিনা সেচেও চাষ করা সম্ভব।

ফসল সংগ্রহ: গাছের ফল যখন শুষ্ক খড়ের রং ধারণ করে ও গাছের পাতা শুকিয়ে যায় তখন গাছ গুলোকে কেটে শক্ত মাটিতে বা মাটির উপর পলিথিন বিছিয়ে অথবা পাকা মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে শুকাতে হবে। তারপর রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে লাঠি দিয়ে গাছের ফল গুলোকে পিটিয়ে মাড়াই করতে হবে। ঝাড়াই করার জন্য কুলা ব্যবহার করা উত্তম। বীজ বপনের ১০৫ দিন থেকে ১১০ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা যায়।

ফলন: ১০০০-১২০০ কেজি/হেক্টর

উপযোগিতা: গাজীপুর, দিনাজপুর, জামালপুর, যশোর, রংপুর, হাটহাজারী দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খরা প্রবন রাজশাহী ও বরেন্দ্র অঞ্চল চিয়া চাষ করা যেতে পারে। অনাবাদী ও পতিত জমি উঁচু থেকে মাঝারী উঁচু এবং চরাঞ্চলে।

আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট

- চিয়া বীজ বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষ করা যায় এবং এতে রোগ পোকামাকড়ের আক্রমণ তেমন হয় না।
- চিয়া বীজ দেহের ওজন কমাতে সহায়তা করে
- চিয়া বীজ ব্লাড সুগার (রক্তের চিনি) কমাতে সাহায্য করে। ফলে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি কমায়
- চিয়া একটি উচ্চ মূল্যের ফসল বিধায় আমাদের দেশের কৃষকরা চিয়া চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন।
- চিয়া বিভিন্ন ফসল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যেমন চিয়া-ভুট্টা-আমন/ চিয়া-মুগডাল-আউশ-আমন।

চিয়ার দৈহিক বৃদ্ধি পর্যায়

চিয়ার ফুল আসা পর্যায়

সংগৃহীত চিয়া বীজ

চিয়ার পরিপক্ক পর্যায়

প্রযুক্তি: আন্ত:ফসল হিসেবে মুখীকচুর সাথে রসুনের চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ অঞ্চলে কৃষকের জমিতে আন্ত:ফসল হিসেবে মুখীকচুর সাথে রসুনের চাষ করার ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- বগুড়া অঞ্চলে নতুন আন্ত:ফসল হিসেবে মুখীকচুর সাথে রসুনের চাষ করার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে।
- উন্নত এই আন্ত:ফসল চাষ করার মাধ্যমে প্রতি হেক্টরে মোট মুনাফা ১৫১১৬৩০/- টাকা যেখানে কৃষকের প্রচলিত শুধু মুখীকচুর উৎপাদনে মুনাফা মাত্র ১০৪৭৫৮০/- টাকা

উপযোগিতা: শিবগঞ্জ, বগুড়া ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩

প্রযুক্তির ব্যবহারের তথ্য

বিষয়	আন্ত:ফসলের বিবরণ	
ফসল	মুখীকচু	রসুন
জাত	বর্ধমান	বারি রসুন -১
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৭০ সেমি × ৩০ সেমি	১৫ সেমি × ১০ সেমি
বপন/রোপণ সময়	ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহ	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	মুখীর ছড়া ৫০০ (১৫-২০ গ্রাম/মুখী)	৪০০ (কোয়া)
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	৩০০	
টিএসপি	২০০	
এমওপি	৩৫০	
জিপসাম	১৫০	
জিংক সালফেট	১৬	
বরিক এসিড	১২	
গোবর টন/হেক্টর	১০	

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সমস্ত গোবর এবং অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্য সমস্ত সার জমি তৈরি শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে বাকি ইউরিয়া সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ অঙ্কুরোদ্‌গমের ২৫ দিন পর এবং অন্য ভাগ ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল: মুখীকচু ও রসুন

ফসলের আন্ত:পরিচর্যা: আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং কন্দ গঠণের আগ পর্যন্ত তিন বার রসুন নিড়ানী দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: ২০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে বর্ষাকালে সেচের প্রয়োজন নাই।

রোগ বালাই দমন: মুখীকচু ও রসুনে পাতা ঝলসানো রোগের জন্য ডাইথেন এম-৪৫ (২ গ্রাম/লিটার) পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: মুখীকচুর পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে এবং ধীরে ধীরে মারা যেতে থাকলে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। রসুনের পাতার অগ্রভাগ হলদে বা বাদামী হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে তখন বুঝতে হবে পরিপক্ক হয়েছে।

ফসল সংগ্রহের সময় কাল: এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রসুন এবং জুনের প্রথম সপ্তাহে মুখীকচু সংগ্রহ করা হয়।

জীবনকাল (দিন): মুখীকচু: ১৭৫ এবং রসুন: ১৪০

ফলন (টন/ হে:): মুখীকচু: ৩২.৫৯ এবং রসুন: ৫.৩৪

আন্ত:ফসল হিসেবে মুখীকচুর সাথে রসুনের চাষ

প্রযুক্তি: বারি উদ্ভাবিত বীজ বপন যন্ত্রের মাধ্যমে সারিতে বীজ বপন, উপকূলীয় এলাকার একটি লাভজনক

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে বারি বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে সয়াবীনের বীজ বপন প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বীজ বপনের খরচ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় করে সয়াবীন বীজ বপন করা সম্ভব হয়েছে।

- সঠিক গভীরতা এবং দূরত্বে বীজ বপনের ফলে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সয়াবীন চাষে কৃষকদের নিট লাভ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপযোগী এলাকা: বৃহত্তর নোয়াখালী এবং অনুরূপ এলাকা।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত।
- এই যন্ত্রটি বীজকে নির্দিষ্ট স্থান ও সঠিক গভীরতায় সুষমভাবে বপন করে।
- বীজের মান ভাল হলে অঙ্কুরোদ্‌গম এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক চারাগাছ নিশ্চিত করা যায়।
- এটি ব্যবহার করে প্রচলিত ছিটিয়ে বপন পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ বীজ কম লাগে এবং ফলন ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।
- সারিবদ্ধভাবে বীজ বপনের ফলে নিড়ানী যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। ফলে আগাছা দমন, বালাইনাশক প্রয়োগসহ অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা করার জন্য প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২০-২৫ শতাংশ খরচ ও সময় কম লাগে।

যন্ত্র ব্যবহার পদ্ধতি: পাওয়ার টিলার এর রোটাভেটর খুলে যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ফারো ওপেনারের সাহায্যে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি. (খরিফ মৌসুমে ৪০ সেমি) ও বীজের গভীরতা ঠিক করে নিতে হয়। জমির এক প্রান্তে (উত্তর বা দক্ষিণে) পাওয়ার টিলার নিয়ে জমির 'জো' অবস্থা ও বীজের আকার অনুযায়ী গভীরতা ঠিক করে নিতে হয়। বীজ হার ঠিক রাখার জন্য নির্ধারিত বীজ পেট ও পিনিয়াম চেইন সংযুক্ত করে নিতে হয়। যন্ত্রে পরিমাণমতো বীজ ঢেলে পাওয়ার টিলারের গিয়ার ২ নম্বরে রেখে (গতি ২-২.৫ কিমি/ঘণ্টা) যন্ত্রটি চালানো শুরু করলে প্লাস্টিক টিউবের মধ্যে দিয়ে সারিতে বীজ পড়েতে থাকে। ঠিকমতো বীজ পড়ছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। জমির শেষ মাথায় গিয়ে পাওয়ার টিলার ঘোরানোর সময় এর হাতলের সাহায্যে বপন যন্ত্রটি উঁচু করে ঘুরাতে হয় এবং পাশের সারিতে বীজ বোনা শুরু করা হয়। মিটারিং ডিভাইস ঠিক মতো ঘুরছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সয়াবিন দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটিতে চাষের জন্য উপযোগী। খরিফ বা বর্ষা মৌসুমে জমি অবশ্যই উঁচু ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সম্পন্ন হতে হবে। রবি মৌসুমে মাঝারি নীচু জমিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি: মাটির প্রকারভেদে ট্রাক্টর বা পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে প্রথমে ১-২ টি চাষ দিতে হবে। এর পরে বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে সয়াবিনের বীজ বপন করতে হবে।

বীজ বপন সময়: বাংলাদেশে শীত (রবি) ও বর্ষা (খরিফ) উভয় মৌসুমে সয়াবিন চাষ করা হয়। পৌষ মাসে (মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি) বীজ বপনের উত্তম সময়। বর্ষা মৌসুমে শ্রাবণের শুরু থেকে ভাদ্রের মধ্য পর্যন্ত (মধ্য জুলাই থেকে আগষ্টের শেষ) বপন করা উত্তম।

বীজ বপন পদ্ধতি: বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে মৌসুম ভেদে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি রেখে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৫-৬ সেমি. রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাই (হেক্টর প্রতি)
ইউরিয়া	৫০-৬০ কেজি
টিএসপি	১৩০-১৭৫ কেজি
এমওপি	১০০-১২০ কেজি
জিপসাম	৮০-১১৫ কেজি
বোরন (প্রয়োজন বোধে)	৮-১০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সবটুকু সার ছিটিয়ে শেষ চাষের পূর্বে জমিতে ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

অণুজীব সার প্রয়োগ: এক কেজি বীজের সাথে ৭০-৭৫ গ্রাম অণুজীব সার ছিটিয়ে দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। এই বীজ সাথে সাথে বপন করতে হবে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না।

পানি সেচ: প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-৩০ দিনের মধ্য (ফুল আসার পূর্বে) এবং দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে (শুঁটি গঠনের সময়) দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: চারা গজানোর ২০-৩০ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গ মিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিপ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম।

পরিপক্বতা ও ফসল সংগ্রহ: সয়াবিন বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ৯০-১১০ দিন সময় লাগে। ফসল পরিপক্ক হলে শুঁটিসহ গাছ হলদে হয়ে আসে এবং পাতা

ঝরে পড়তে শুরু করে। এ সময় গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

ফলন: বারি বপন যন্ত্রের সাহায্যে বারি সয়াবিন-৫: ২০০০-২০৫০ কেজি/হেক্টর

প্রচলিত পদ্ধতি: ১৮০০ কেজি/হেক্টর

যন্ত্রের মাধ্যমে সারিতে বীজ বপন প্রযুক্তির মাধ্যমে সয়াবিন উৎপাদন।

প্রযুক্তি: চার ফসলের পেঁয়াজ ভিত্তিক পেঁয়াজ (পাতাসহ)-পেঁয়াজ (বাল্ব)-রোপা আউশ-রোপা আমন ফসলধারা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- কৃষকের প্রচলিত ফসলধারায় (পেঁয়াজ-পাট-রোপা আমন) পেঁয়াজ (পাতাসহ) এবং রোপা আউশ ধান অন্তর্ভুক্ত করে তিন ফসলের ধারাকে চার ফসলে রূপান্তরিত করা হয়েছে।
- নতুন ধারায় স্বল্প মেয়াদী ব্রিধান৭৫ আমন মৌসুমে রোপণ করে সময়মত পেঁয়াজ বপন করা সম্ভব হয়েছে।
- নতুন ধারায় উচ্চ ফলনশীল রোপা আউশ (ব্রিধান৯৮) জাত সংযোজন করে ফসলধারায় দানা ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- উদ্ভাবিত ফসলধারায় ধানের সমতুল্য ফলন সর্বোচ্চ ৮৭.৩৬ টন/হেক্টর পাওয়া যায় সেখানে প্রচলিত ধারায় সর্বোচ্চ ২৬.৩৭ টন/হেক্টর পাওয়া যায়।
- প্রচলিত ফসলধারার চেয়ে উদ্ভাবিত ফসলধারায় কৃষক সর্বোচ্চ ২৮০-৩৫০% বেশি লাভ পায়।
- প্রচলিত ধারার চেয়ে বেশি পরিমাণ শ্রমিকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উপযোগিতা: উপযোগী অঞ্চলঃ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ এবং এর অনুরুপ অঞ্চল

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
ফসল	পেঁয়াজ (পাতাসহ)	পেঁয়াজ (বাল্ব)	রোপা আউশ	রোপা আমন
জাত	বারি পেঁয়াজ-১	বারি পেঁয়াজ-১	ব্রিধান৯৮	ব্রিধান৭৫
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	১০ × ৮	১০ × ৫	২০ × ১৫	২০ × ১৫
বপন/রোপণের সময়	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ হতে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ	ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির ২য় সপ্তাহ	এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ হতে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ	জুলাইয়ের ২য় সপ্তাহ হতে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	২২০	২২০	১৫০	১৬৫
টিএসপি	৪০০	৪০০	৭৫	৬০
এমওপি	১৫০	১৫০	৮০	১১০
জিপসাম	১০০	১০০	৩৫	৬০
জিংক সালফেট	১৫	১৫	১০	১০
বরিক এসিড	৭.৫	৭.৫	-	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া ও পটাশ এবং অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও পটাশ কন্দ লাগানোর ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	১/৩ ভাগই ইউরিয়া, ১/২ ভাগ পটাশ ও সকল সার জমি তৈরির শেষ চাষে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ২/৩ ভাগ ইউরিয়া, ১/২ ভাগ পটাশ সমান দুই ভাগ করে যথাক্রমে চারা রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার বাদে অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া তিন কিস্তিতে চারা রোপণের ৭-১০ দিন, ২০-২৫ দিন এবং ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক পটাশ সার ইউরিয়া সারের শেষ উপরি প্রয়োগের সময় ছিটিয়ে দিতে হবে।	ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ সার বাদে অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া তিন কিস্তিতে চারা রোপণের ৭-১০ দিন, ২০-২৫ দিন এবং ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক পটাশ সার ইউরিয়া সারের শেষ উপরি প্রয়োগের সময় ছিটিয়ে দিতে হবে।

ফসলের আন্ত:পরিচর্যা: পাতাসহ পেঁয়াজ আবাদের ক্ষেত্রে কন্দ রোপণের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করে জমিতে অবশিষ্ট সার প্রয়োগ করে পানি দিতে হবে। পেঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের সময় পেঁয়াজের চারা রোপণের পর একটি প্লাবন সেচ দিতে হবে। জমিতে 'জো' এলে মাটিতে জমা চটা ভেঙ্গে দিতে হবে ও নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে ২-৩ বার আগাছা দমন ও নিড়ানী দিতে হয়। জমির প্রয়োজন অনুসারে কন্দ উৎপাদনের জন্য ৮-১০ পর্যন্ত সেচ লাগতে পারে। পেঁয়াজে বেগুনী দাগ রোগ বেশি হয় এবং এই রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল বা রিডোমিল গোল্ড মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে দিতে হবে। ধানের ক্ষেত্রে চারা রোপণের পর হতে জমিতে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে এবং থোর আসার সময় জমিতে ২-৩ ইঞ্চি পানি থাকতে হবে। ধানের জমিতে সাধারণত মাজরা পোকার আক্রমণ বেশি হয়। তাই মাজরা পোকার আক্রমণ বেশি হলে ফুরাডান/কার্বোফুরান ১৫ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করতে হবে। ধানে বাষ্ট হলে নেটিভো ৬ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে দিয়ে ৫ শতক জমিতে ৫-৭ দিন ব্যবধানে ২ বার স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া, টুংরো, উফরা, খোলপোড়া, বাকানি, বাদামি দাগ রোগ ইত্যাদি হতে পারে। উলেখিত রোগ দেখা গেলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহের সময় (ফসলের সময়কাল):

পেঁয়াজ (পাতাসহ): ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহ (৪৮-৫৫ দিন)।

পেঁয়াজ (বাল্ব): মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ (৮২-৮৫ দিন)।

রোপা আউশ: জুলাইয়ের ১ম সপ্তাহ (৮৫ দিন)।

রোপা আমন: অক্টোবরে ২য় সপ্তাহ (৮৯ দিন)।

প্রযুক্তি হতে ফলন

ফসল	পেঁয়াজ (পাতাসহ)	পেঁয়াজ (বালব)	রোপা আউশ	রোপা আমন
ফলন (টন/হেক্টর)	২৩.৩৩-২৭.২	১৭.৮৪-২০.৫৭	৪.০-৪.৪৭	৪.৯৬-৪.৯৭
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর/বছর)	৫৫.৪১-৮৭.৩৬			
লাভক্ষতির বিবরণ (টাকা/হেক্টর)	মোট আয় (টাকা/হেক্টর)		১৬৯৭১৭০-২৬৫৪০২০	
	উৎপাদন ব্যয় (টাকা/হেক্টর)		৬৭৬৮৩৭-৬৮৯২৭৪	
	নিট মুনাফা (টাকা/হেক্টর)		১০২০৩৩৩-১৯৬৪৭৪৬	

প্রযুক্তির প্রভাব: পেঁয়াজ একটি বহুল ব্যবহৃত ও মসলাজাতীয় ফসল। এই উন্নত ফসলধারায় এক মৌসুমে দুইবার পেঁয়াজ উৎপাদন সম্ভব হয় তাই পেঁয়াজের সামগ্রীক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত শস্য বিন্যাসে একটি পেঁয়াজ ও একটি ধান অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত করায় মসলা ও দানাদার খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়ক হবে। এছাড়া এই পেঁয়াজ ভিত্তিক ফসলধারা ব্যবহারে ফসলের নিবিড়তা, উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয়বৃদ্ধি পাবে। ফলে ফসলধারাটি আগামীতে পেঁয়াজের ক্রমবৃদ্ধিমান চাহিদা পূরণে ও বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনে একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রযুক্তি হিসাবে কাজ করবে। উদ্ভাবিত ধারাটির সব ফসল প্রচলিত জাতের ও আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল ব্যবহার করায় এটি মানব স্বাস্থ্য, মাটি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।

চার ফসলের পেঁয়াজ ভিত্তিক পেঁয়াজ (পাতাসহ)-পেঁয়াজ (বাল্ব)-রোপা আউশ-রোপা আমন ফসলধারা একটি লাভজনক প্রযুক্তি

প্রযুক্তি: ট্রে পদ্ধতিতে আদার চারা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত মিডিয়া

সাধারণত আদা চাষে ৪৫-৫০ গ্রাম ওজনের আদার কন্দ রোপণ করা হয়। এই কারণে, এক হেক্টর জমিতে আদা চাষের জন্য ২৫০০-২৮০০ কেজি বীজ আদার প্রয়োজন হয় যা আদা উৎপাদনে প্রাথমিক খরচের পরিমাণ অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া, আদা রোপণের পর, চারা গজানোর জন্য ৩০-৪০ দিন সময় লাগে। ফলে আদা অঙ্কুরিত হওয়ার আগে মাঠ আগাছায় ভরে যায়। একই সময়ে বৃষ্টিপাত হলে আদা গজানোর আগে কন্দপচে যাওয়ার শঙ্কা বেড়ে যায়। চারা করে আদা রোপণ করা হলে এই সমস্যা থেকে উত্তোরণ সম্ভব ও সেই সাথে আদা উৎপাদনের প্রাথমিক খরচ কমে যাবে।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- আদার চারা উৎপাদনের উপযুক্ত মিডিয়া হল কোকো ডাস্ট।
- এছাড়া কোকো ডাস্টের বিকল্প হিসেবে পচা কাঠের গুঁড়াতেও ভালো চারা উৎপাদন করা যায়।
- এই প্রযুক্তি ব্যবহারে আদা চাষে বীজের খরচ প্রায় অর্ধেক কমে যায়।
- সরাসরি চারা রোপণ করায় মাঠে ফসলের জীবনকাল প্রায় ৩০-৪৫ দিন কমে যায়।
- এই প্রযুক্তি ব্যবহারে আদার আগাম কন্দ পচা রোগের ঝুঁকি কমে যায়।

ট্রে পদ্ধতিতে উৎপাদিত আদার চারা

কোকো ডাস্ট এ উৎপাদিত আদার চারা

কাঠের গুঁড়ায় এ উৎপাদিত আদার চারা

প্রযুক্তির বিবরণ: আদার চারা উৎপাদনের জন্য, আদার কন্দের অগ্রভাগ হতে ছোট টুকরা (৬-১০ গ্রাম) করে কাটা হয়। তারপর কাটা টুকরা গুলিকে ছত্রাকনাশকে (ম্যানকোজেব + মেটালাক্সিল) ২ গ্রাম/লিটার হারে প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য ডুবিয়ে রাখা হয়। অতঃপর টুকরোগুলো ছত্রাকনাশক হতে তুলে নিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় ২৪ ঘণ্টা রাখতে হয়। ফলে কাটা অংশে সুবেরিন নামে এক ধরনের আবরণ তৈরি হয়, যাতে ওই অংশ দিয়ে ছত্রাক প্রবেশ করতে না পারে। তারপর আদার শোধনকৃত টুকরাগুলিকে বীজ কন্দ হিসাবে ট্রেতে উপযুক্ত মিডিয়ায় (কোকো ডাস্ট) বসিয়ে দিতে হয় এবং একদিন অন্তর অন্তর পর্যাপ্ত সেচ প্রদান করতে হয়। বীজ কন্দ ট্রেতে বসানোর ৩০-৪০ দিনের মধ্যে আদার চারা তৈরি হয়। তারপর মিডিয়া সহ ট্রে থেকে চারাগুলো তুলে মাঠে রোপণ করা হয়।

উপযোগিতা: বাংলাদেশের সকল আদা উৎপাদন অঞ্চলে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব। বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাসহ বাণিজ্যিকভাবে চরা উৎপাদনকারী সকল প্রতিষ্ঠান/নার্সারি এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবেন।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: এই পদ্ধতির ফলে আদার চরা উৎপাদনে কৃষক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তাছাড়া বাণিজ্যিক ভাবে চরা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান/নার্সারি এ পদ্ধতি ব্যবহার করে আদার চরা উৎপাদন করে কৃষক পর্যয়ে বিক্রি করতে পারবেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত চরা মাঠে লাগালে আদা উৎপাদনে বীজের খরচ অর্ধেকে নেমে আসবে।

প্রযুক্তি: আগাম জাত হিসেবে বারি আলু-৭৯ এবং ৭৭ দেশের উত্তরাঞ্চলে চাষের উপযোগী

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: জমিতে আগাম জাতের আমন ধান রোপণ করা নিশ্চিত করতে হবে অক্টোবরের মাঝামাঝি অথবা তার আগেই আলু বীজ রোপণ করতে হবে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: উপযোগী অঞ্চল: রংপুর ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৩ এর অনুরুপ অঞ্চল।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য

বিষয়	: ফসলের বিবরণ
ফসল	: আলু
জাত	: বারি আলু-৭৭ এবং বারি আলু-৭৯
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	: ৬০ × ২৫
বপন/রোপণের সময়	: অক্টোবরের মাঝামাঝি অথবা তার আগে
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	২৯০
টিএসপি	১৫০
এমওপি	২২০
জিপসাম	১১০
জিংক সালফেট	৬
বরিক এসিড	৬
গোবর	৫০০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ৩০-৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

মাঠে ফসলের অবস্থান (দিন): ৯০-৯৫

ফলন (টন/হেক্টর): **স্থানীয় জাত:** ২৯.১৭ এবং **উন্নত জাত:** বারি আলু-৭৭: ৩৪.২৮ এবং বারি আলু-৭৯: ৪১.৫০।

প্রযুক্তির অভিযোজনের ঝুকি: কোন ঝুকি নাই

প্রযুক্তি বিস্তারের পদ্ধতি: বক প্রদর্শণী, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, বুকলেট ও লিফলেট ইত্যাদি।

প্রত্যাশা: মোট উৎপাদন বৃদ্ধি

আর্থ সামাজিক অবস্থায় মোট প্যাটানের্র অবস্থা:

জাত	মোট আয় (টাকা/হেক্টর)	মোট খরচ (টাকা/হেক্টর)	মোট লাভ (টাকা/হেক্টর)
বারি আলু-৭৭	৬৫৬৫৬৪	১৬৫০০০	৪৯১৫৬৪
বারি আলু-৭৯	৯১০৪০৪	১৬৫০০০	৭৪৫৪০৪
স্থানীয় জাত	৬৪৮৬৬০	১৬৫০০০	৪৮৩৬৬০

ফসলের আন্ত:পরিচর্যা: আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। গাছের বৃদ্ধি ও অধিক ফলন পাওয়ার জন্য সময় মত আগাছা নিড়িয়ে দিতে হবে।

সেচ-প্রয়োগ: আলু বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ দিতে হবে। দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে এবং তৃতীয় সেচ বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে দিতে হবে। খরা প্রবণ এলাকায় বেশি ফলন পেতে হলে ৮-১০ দিন পর সেচ দিতে হবে।

রোগ বালাই দমন: রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে এবং সম্ভব হলে বীজ শোধন করে নিতে হবে। জমিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সময়মত ছত্রাক নাশক ও কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: আগাম জাত হিসেবে ৬০ থেকে ৭০ দিন বয়স হলেই গাছ থেকে আলু উত্তোলন করা যায়

প্রযুক্তি হতে প্রাপ্ত ফলন/ প্রাপ্তি: স্থানীয় জাত আলুর তুলনায় শতকরা ৩.৪২ ভাগ বেশি ফলন হয়।

আগাম জাত হিসেবে বারি আলু-৭৯ এবং ৭৭ দেশের উত্তরাঞ্চলে চাষের উপযোগী

প্রযুক্তি: রংপুর অঞ্চলে সুপারির বাগানে বিভিন্ন ধরনের আন্তঃফসল চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- প্রাথমিক উৎপাদন খরচ কম।
- জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়।
- বছরব্যাপী কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়।

সুপারির বাগান

কলা

প্রযুক্তির উপযোগিতা: রংপুর বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ।

মৌসুম: বছরব্যাপী।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য

- সুপারি বাগানে গড়ে ৩ মিটার দূরত্বে (গাছ ও সারি) গাছ লাগানো হয়।
- সুপারি গাছের দুই সারির মাঝখানে বিভিন্ন প্রকার সবজি, মসলা, ফল জাতীয় ফসল চাষ করতে হবে।

- চাষকৃত আন্তঃফসলসমূহের উন্নত জাত (বারি উদ্ভাবিত) ব্যবহার করতে হবে।
- সুপারি গাছের দুই সারির মাঝখানে কলা ও মিষ্টিকুমড়া ৩ মিটার দ্ধ ২ মিটার দূরত্বে এবং ঢেঁড়স ও হলুদ ৬০ সেমি × ২৫ সেমি দূরত্বে লাইনে রোপণ করতে হবে।
- কলা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মিষ্টিকুমড়া মধ্য নভেম্বর, ঢেঁড়স ও হলুদ মধ্য মার্চ হতে এপ্রিল মাসের (প্রথম বৃষ্টির পর) লাগাতে হবে।
- আন্তঃফসলসমূহের ক্ষেত্রে অনুমোদিতহারে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়।

প্রযুক্তি হতে প্রাপ্ত ফলন: সুপারি বাগানে একক ফসলের পরিবর্তে আন্তঃফসল হিসাবে সুপারি+কলা চাষে ৩০.৯%, সুপারি+মিষ্টিকুমড়া+ঢেঁড়স চাসে ৪১.৪৫% ও সুপারি+হলুদ চাষে ২১.২% মুনাফা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্রযুক্তি: ডগা কর্তনের মাধ্যমে মিষ্টিকুমড়ার ফলন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- অগ্রভাগের ডগা কর্তনের মাধ্যমে মিষ্টিকুমড়ার ফলন বৃদ্ধি পায়।
- ডগার কর্তিত অংশ উচ্চ পুষ্টিমানের শাক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- কৃষকরা স্বল্প পরিশ্রম ও স্বল্প খরচে পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারে।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পুরণ হয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: রংপুর বিভাগের আওতাধীন চরাঞ্চলসমূহ।

মৌসুম: রবি।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য

- পলিব্যাগে মিষ্টিকুমড়ার চারা করে ২০-২৫ দিন বয়সের চারা মাদায় (৫০×৫০×৫০ সেমি) স্থাপন করতে হবে।
- চারা ৮-১২ পাতা অবস্থায় প্রধান ডগার অগ্রভাগের অংশ (০.৫ ইঞ্চি) পরিমাণ ভেঙ্গে দিতে হবে।
- এ প্রক্রিয়া তৃতীয়বার পর্যন্ত করতে হবে যা ৩জি পদ্ধতি নামে পরিচিত।

- চারার বয়স ৪৫ দিন হলে অর্থাৎ প্রথম বার ফল ধারনের পর প্রতিটির ডগার ১০-১২ ইঞ্চি পরিমাণ (শাক খাওয়ার উপযোগী) কেটে নিতে হবে, যা পরবর্তীতে ডগার সংখ্যা বৃদ্ধি ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।

প্রযুক্তি হতে প্রাপ্ত ফলন: সাধারণ বা কৃষক পদ্ধতি অপেক্ষা ডগা কর্তন পদ্ধতিতে ফলন প্রায় ১৭.৫% এবং মুনাফা প্রায় ৩৩.০১% বৃদ্ধি পায়।

ডগা কর্তনের মাধ্যমে মিষ্টিকুমড়ার ফলন বৃদ্ধি

প্রযুক্তি: পালংশাকের ফলন বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার উর্বরতা উন্নয়নে ৪৫ দিনের কম্পোস্টের ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- পালংশাক চাষে ৪৫ দিনের পচা কম্পোস্টে ব্যবহার করলে, ফসলের পুষ্টির চাহিদার সময় অধিক পুষ্টি সহজলভ্য হয় ।
- ফলে শুধুমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে যে ফলন পাওয়া যায় তার চেয়ে ১১৪% ফলন বেশি পাওয়া যায়।
- এছাড়া ৭৫ দিনের পচা কম্পোস্ট ব্যাবহার করলে মাটিতে তুলনামুলক কম পানি, কম রাসায়নিক সার প্রয়োজন হয়।
- মাটির আয়তনী ঘনত্ব কমে যায়, পানি ধারণ ক্ষমতা ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: অঞ্চল: কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮, এলাকা: গাজীপুর, মৌসুম: রবি।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য: শস্য- পালংশাক, জাত- বারি পালংশাক-২।

বপনের সময়: ১৫-৩০ নভেম্বর।

সারের মাত্রা:

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৩০০ কেজি
টিএসপি	২০০
এমওপি	১২০
জিপসাম	৮০
জিঙ্ক সালফেট	৬
কম্পোস্ট	১৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পালংশাক চাষের জন্য ইউরিয়া ব্যতীত সমুদয় অন্যান্য সার এবং কম্পোস্ট শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে সমান দুই ভাগে বীজ বপনের ১৫ এবং ৩০ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা-রোগ-পোকা দমন: বীজ বপনের ১৪ এবং ২৮ দিন পর আগাছা দমন করতে হয়, কোনো প্রকার বালাইনাশকের প্রয়োজন হয় না।

কর্তনের সময়: ০৫-১৫ জানুয়ারি।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: ফলন: পুর্বে--১৮-২০ টন/হেক্টর, পরে- ২০-২২ টন/হেক্টর।

পালংশাকের ফলন বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার উর্বরতা উন্নয়নে কম্পোস্টের ব্যবহার

প্রযুক্তি: করলার ফলন ও গুণাগুণ বৃদ্ধিতে বোরন সারের ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- ১.৫ কেজি/হেক্টর বোরন সার প্রয়োগ করে করলার সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।
- বোরন সার প্রয়োগে করলার ফুল ঝরানো কমে যায় ।
- ফল ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- উৎপাদন খরচ কমে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: এই প্রযুক্তিটি গাজীপুরের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল -২৮ এলাকায় খরিপ-১ মৌসুমের জন্য উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য: শস্য- করলা, জাত- বারি করলা-৪।

বীজ বপনের সময়: জানুয়ারি।

বীজ রোপণের সময়: ফেব্রুয়ারি।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২২৪ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমওপি	৮৪ কেজি
জিপসাম	৫৬ কেজি
জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট)	
অথবা	১.৪ কেজি
জিংক সালফেট (হেপ্টাহাইড্রেট)	২.৪ কেজি
বোরিক এসিড	৯ কেজি
গোবর	০৫ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সমস্ত গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিংক, বোরিক এসিড সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় মৌল মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ৬ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি চারা রোপণের সময় এবং অবশিষ্ট ৫ কিস্তি ইউরিয়া ১৫-২০ দিন পর পর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: করলা ফসলের নিবিড় যত্ন যেমন-গাছের গোড়ায় বাঁশের কাঠি পুতে দেওয়া, মাচা দেওয়া এবং পোকা মাকড় দমনের জন্য রোপণের ১ সপ্তাহ পর ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: ফলন/প্রাপ্তি: ২৩.৪২ টন/হেক্টর। বোরন সার প্রয়োগের ফলে করলার ফলন (২৩.৪২ টন/হে.) বৃদ্ধি পায় এবং ফুল ঝরানো হ্রাস পায় প্রায় ৫০%।

প্রযুক্তি: বোরন সার পাতায় সিঞ্চণ প্রয়োগে (Foliar spray) সূর্যমুখী চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: মাটিতে অনুপুষ্টির অভাবে সূর্যমুখীর ফলন অনেক কম হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণ ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপি সার ব্যবহার করলেও পরিমিত পরিমাণ বোরন সার ব্যবহার না করলে বেশী ফলন আশা করা যায় না।

- বোরন সার সিঞ্চণ আকারে সূর্যমুখী গাছে প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি পায় এবং
- বীজের বন্ধাত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ চিটা বীজের সংখ্যা কমে যায়।
- বীজের আকারও বড় ও পুষ্ট হয়।
- উৎপাদন খরচও কমানো সম্ভব হয়

প্রযুক্তির উপযোগিতা: এই প্রযুক্তিটি গাজীপুরের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল -২৮ এলাকায় রবি মৌসুমের জন্য উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য: শস্য- সূর্যমুখী, জাত- বারি সূর্যমুখী -৩

বীজ বপনের সময়: নভেম্বর

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৩০৪ কেজি
টিএসপি	২১৩ কেজি
এমওপি	১৬২ কেজি
জিপসাম	১৬১ কেজি
জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট)	
অথবা	০৮ কেজি
জিংক সালফেট (হেপ্টাহাইড্রেট)	১৪কেজি
গোবর	০৫ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিংক ও জিপসাম সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া ৩ কিস্তিতে (অর্ধেক বপনের সময় এবং বাকি অর্ধেক সমান দুই কিস্তিতে বপনের ২০-২৫ ও ৪০-৫০ দিন পর) প্রয়োগ করতে হবে।

সিঞ্চন প্রয়োগ: বোরন প্রতি লিটারে ১৫০ মিলিগ্রাম হারে প্রতি বর্গমি. এ ২.৫ লিটার দ্রবণ বপনের ২০-২৫ দিন এবং ৪০-৪৫ দিন পর পাতায় সিঞ্চণ প্রয়োগ করতে হবে। গাছকে সম্পূর্ণভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। সকালে (৮-৮:৩০) স্প্রে করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন সিঞ্চণের পূর্বে পাতা ভেজা না থাকে। প্রখর সূর্যালোকে স্প্রে করা যাবে না।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: ফসলের নিবিড় যত্ন যেমন- আগাছা দমন, রোগ পোকা দমন, সার প্রয়োগ, পানিসেচ, নিষ্কাশন, আন্তরণ ভেঙ্গে দেওয়া এবং মাটি ঝুরঝুরে রাখা আবশ্যক।

ফসল কর্তনের সময়: মার্চ।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: ফলন/প্রাপ্তি- ২.২৫ টন/হেক্টর, প্রতি বর্গমিটারে ২.৫ লিটার বোরন প্রয়োগে সূর্যমুখীর সর্বোচ্চ ফলন (২.২৫ টন/হেক্টর) বৃদ্ধি পায় এবং বীজের বন্ধ্যাত্ব হ্রাস প্রায় ২০%।

বোরন সার পাতায় সিঞ্চণ প্রয়োগে সূর্যমুখী চাষ

প্রযুক্তি: পেঁয়াজের বৃদ্ধি ও ফলনে অ্যাজোটোব্যাক্টরের প্রভাব

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- পেঁয়াজ চাষে তরল অ্যাজোটোব্যাক্টর ইনোকুলাম ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে।
- অ্যাজোটোব্যাক্টর অণুজীব বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে পেঁয়াজ গাছকে দেয়
- অ্যাজোটোব্যাক্টর ইনোকুলাম ও ৮০% ইউরিয়া রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে পেঁয়াজ উৎপাদনে শতকরা ৪-৭ ভাগ ফলন বৃদ্ধিসহ শতকরা ২০ ভাগ ইউরিয়া রাসায়নিক সার সাশ্রয় সম্ভব।

প্রযুক্তির উপযোগীতা: অঞ্চল: গাজীপুর, মধুপুর অঞ্চল (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮)

মৌসুম: বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুম পেঁয়াজ চাষের জন্য উপযুক্ত সময়।

মাঠ পর্যায়ের তথ্য: জাত- বারি পেঁয়াজ-৪

জমি ও মাটি: দো-আঁশ ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও পলিযুক্ত মাটি

বপনের সময়: অক্টোবর-নভেম্বর।

বীজের হার: ৩.৫-৪ কেজি/হেক্টর।

বপন পদ্ধতি: সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি। অ্যাজোটোব্যাক্টর ১০৮ কোষ মিলিলিটার-১ তরল ইনোকুলাম।

সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর): [মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে পরিবর্তনশীল]।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
অ্যাজোটোব্যাক্টর অণুজীব সার	১০৮ কোষ মিলিলিটার-১ তরল ইনোকুলাম
ইউরিয়া	২১৭
টিএসপি	২৭৫
এমওপি	১৫০
জিপসাম	১২২
জিংক সালফেট	১৪

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় ইউরিয়া বাদে অন্যান্য সার ও ১/৩ অংশ এমওপি সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া এবং বাকি ২/৩ অংশ এমওপি চারা রোপণের পর যথাক্রমে ৩ কিস্তিতে ও ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে ।

সেচ প্রয়োগ: প্রয়োজন মত।

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৯০-১২০ দিন পর (মার্চ)।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: ফলন- প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ২২.০০ - ২২.১৮ টন/হেক্টর এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের পরে ২৩.৫০ - ২৩.৭৫ টন/হেক্টর।

পূর্বে: টন/হেক্টর (২২.১৮=২০১৯-২০; ২১.৮০=২০২০-২১)

পরে: টন/হেক্টর (২৩.৭৫=২০১৯-২০; ২২.৬০=২০২০-২১)

শতকরা বৃদ্ধি: (৭.০৮%=২০১৯-২০; ৩.৬৭%=২০২০-২১)

অ্যাজোটোব্যাক্টর ইনোকুলাম ও ৮০% ইউরিয়া রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে পেঁয়াজ উৎপাদনে শতকরা ৪-৭ ভাগ ফলন বৃদ্ধিসহ শতকরা ২০ ভাগ ইউরিয়া রাসায়নিক সার সাশ্রয় সম্ভব হয়।

পেঁয়াজের বৃদ্ধি ও ফলনে অ্যাজোটোব্যাক্টরের প্রভাব।

প্রযুক্তি: আন্তঃফসল হিসেবে চীনাবাদামের সাথে পাতা পেঁয়াজের চাষ

চীনাবাদাম এক ফসল হিসেবে সাধারণত কৃষক চাষ করে থাকে যা একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল। ঔষধী গুণ ও মূল্যবান ফসল বিবেচনায় বাদামের সাথে আন্তঃফসল হিসেবে পাতা পেঁয়াজ চাষ প্রযুক্তি একটি ভালো সুযোগ যা বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: ১. একই জমিতে এক সাথে ২টি ফসলের চাষ। ২. এক সাথে ভিটামিন ও তেলের সংস্থান। ৩. জমির সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ। ৪. শস্য নিবিড়তা বাড়ানো। ৫. উৎপাদন ও আয় বাড়ানো।

উপযোগী এলাকা: জামালপুর, টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জসহ বিভিন্ন চীনাবাদাম চাষযোগ্য এলাকা।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: চরাঞ্চল, উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি, রবি ও খরিপ মৌসুম।

অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য আমাদের দেশে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। সে ক্ষেত্রে আন্তঃফসল চাষ শস্য নিবিড়তা বাড়ানোর একটি উপায়। কেননা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে একই বছরে, একই জমিতে একসাথে একাধিক শস্য চাষ করা যায় এবং প্রধান ফসলের সমতুল্য ফলন অনেক বেশি পাওয়া যায়। এই ধারা অব্যহত রাখার জন্য তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র বিভিন্ন আন্তঃফসল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে। আন্তঃফসল হিসেবে চীনাবাদামেরর সাথে পাতা পেঁয়াজের চাষ পদ্ধতি তেমনি একটি উদ্ভাবিত প্রযুক্তি।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য/মাঠ পর্যায়ের তথ্য

প্রযুক্তির বর্ণনা: ফসলের জাত: বাদাম: বারি চীনাবাদাম-১০ এবং পাতা পেঁয়াজ: বারি পাতা পেঁয়াজ-১।

বপন সময়: বাদাম : মধ্য নভেম্বর - শেষ ডিসেম্বর। পাতা পেঁয়াজ: বাদাম বপনের সময় ৩০ থেকে ৪০ দিনের চারা রোপন করতে হবে।

সারের মাত্রা: হেক্টর প্রতি (কেজি)

ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	বরিক এসিড
২৫	১৬০	৮৫	৩০০	১০

উল্লিখিত সবটুকু সার শেষে চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন: প্রয়োজন অনুযায়ী ১ হতে ২ বার আগাছা দমন করতে হবে।

বাদামের রোগসমূহ ও দমন ব্যবস্থা: পাতা দাগ পড়া, মরিচা ও কাণ্ড পচা রোগ প্রধান।

- মরিচা রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে টিল্ট/কন্টাফ শতকরা ০.০৫ ভাগ হারে (০.৫ মিলি/লি. হারে) ১৫ দিন অন্তর তিনবার ছিটালে রোগের প্রকোপ কমে যায়।
- পাতায় দাগ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে গাছে বেভিস্টিন (১গ্রাম হারে) কন্টাফ (০.৫ মিলি হারে) প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটালে এ রোগের অনিষ্ট থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।
- কাণ্ড পচা রোগ এর জন্য বীজ বপনের পূর্বে ভিটাভেক্স-২০০/প্রোভেক্স নামক ছত্রাকনাশক দিয়ে শতকরা ০.২৫ ভাগ হারে (২.৫ গ্রাম ছত্রাকনাশক/কেজি বীজ) বীজ শোধনের মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থায় রোগের প্রকোপ কমানো যায়।

পাতা পেঁয়াজের রোগ দমন ব্যবস্থা:

বারি পাতা পেঁয়াজ-১ এ তেমন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না বললেই চলে।

ফসল কর্তনের সময়: ১. পাতা পেঁয়াজ: বাদামের জীবনকালের মাঝে ৪ থেকে ৫ বার কর্তন করা যায়। ২. বাদাম: মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: বাদামের সমতুল্য ফলন সর্বোচ্চ ৩.০ টন/হেক্টর এবং লাভ খরচের অনুপাত ৩.০৪।

প্রযুক্তির প্রভাব: এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চরাঞ্চলে এক ফসলী জমিতে চীনাবাদামে সাথে সাথী ফসল হিসেবে পাতা পেঁয়াজ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

চীনাবাদাম+পাতা পেঁয়াজ

পাতা পেঁয়াজ কর্তন

পাতা পেঁয়াজ কর্তন এর পর চীনাবাদাম

প্রযুক্তি: সয়াবিনের প্রধান ক্ষতিকর পোকাসমূহের দমন ব্যবস্থাপনা

সয়াবিন বাংলাদেশের একটি অন্যতম তেল ফসল। এ ফসল উৎপাদন করে কৃষক তেলের ঘাটতি পূরণে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু সয়াবিন চাষাবাদের জন্য কৃষকগণ কিছু সমস্যার সম্মূখীন হয় তার মধ্যে পোকামাকড়ের আক্রমণ অন্যতম। ক্ষতিকর পোকামাকড়ের মধ্যে ফুলের ও ডগার থ্রিপস, পাতার সাদা মাছি ও জ্যাসিড পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বিছা পোকা, সাধারণ কাটুই পোকা অন্যতম। এ সমস্ত পোকামাকড় ফসলের বিভিন্ন পর্যায়ে আক্রমন করে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: এ প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সঠিক সময়ে সয়াবিনের প্রধান ক্ষতিকর পোকা সমূহকে খুব সহজে কম খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে দমন করা যায়।

উপযোগি এলাকা: বাংলাদেশের দক্ষিনাঞ্চলের নোয়াখালী, লক্ষীপুর জেলা ও সয়াবিন উৎপাদনকারী সকল এলাকা।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: চরাঞ্চল, উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি, রবি ও খরিপ মৌসুম।

অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকগণ যততত্র ভাবে বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে সয়াবিনের এ সমস্ত পোকা দমন করার চেষ্টা করে থাকে। যেহেতু বিভিন্ন পোকার আক্রমণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয় এবং আক্রমণ ও ক্ষতিকরার ধরন সম্পূর্ন আলাদা তাই কৃষকগন পোকা দমনে সফল হচ্ছে না। এমতাবস্থায় তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুরের কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ সয়াবিনের প্রধান ক্ষতিকর পোকামাকড়সমূহ দমনের জন্য আইপিএম বা সমন্ধিত বালাই দমন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকরী, কম খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করছেন।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য/মাঠ পর্যায়ের তথ্য

দমন ব্যবস্থাপনা:

- সাধারন কাটুই পোকা এবং বিছা পোকার কীড়া আক্রান্ত পাতা এবং ডগা হাত বাছাই করতে হবে।
- প্রতি বিঘায় দশ মিটার পর পর ৮-১০টি বাঁশের আগা/কঞ্চি পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি বসে কীড়া খেয়ে ফেলতে পারে।
- সাধারণ কাটুই পোকা দমনে দশ মিটার পর পর বিঘা প্রতি ৮-১০টি ফেরোমন ফাঁদ (স্পোডো লিউর) ব্যবহার করতে হবে।

- কীটনাশকের ব্যবহার: সয়াবিন বপনের ৩৫-৪০ দিন পর সিলেক্ট্রাস এঙ্গুলেটাস ১% ই ডব্লিউ (বায়ো চমক) ২.৫ মি.লি./লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করলে পাতা মোড়ানো ও বিছা পোকার পাশাপাশি অন্যান্য শোষক পোকা যেমন থ্রিপস, জ্যাসিড, সাদা মাছি পোকা ও দমন করা যাবে।

এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষিনাঞ্চলের সয়াবিন ফসলে শোষক পোকা, সাধারণ কাটুই পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা এবং বিছা পোকা খুব সহজেই কার্যকারীভাবে কম খরচে, পরিবেশ সম্মত উপায়ে দমন করা যায়।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে সয়াবিন ফসলের প্রধান ক্ষতিকর পোকাসমূহ কার্যকরভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্রযুক্তির প্রভাব: এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উপকুলীয় এলাকাসহ সয়াবিন উৎপাদনকারী সকল এলাকায় কৃষকগন সমন্বিত ভাবে অল্প খরচে সয়াবিনের পোকামাকড় দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

সয়াবিন এর পাতা মোড়ানো পোকা

বিছা পোকা আক্রান্ত সয়াবিন পাতা

ফেরোমন ফাঁদ (স্পোডো লিউর)

সয়াবিনের জমিতে স্থাপিত বাঁশের আগা/কঞ্চি ও ফেরোমন ফাঁদ

প্রযুক্তি: বপন সময় পরিবর্তনের মাধ্যমে সূর্যমুখীর হোয়াইট মোল্ড রোগ দমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সূর্যমুখীর হোয়াইট মোল্ড রোগের প্রাদুর্ভাব হবে না।
- এ প্রযুক্তি কৃষক সহজে ব্যবহার করতে পারবে।
- এ প্রযুক্তি ব্যবহারে কোন খরচ নেই। শুধুমাত্র বপন সময় পরিবর্তন করে এ রোগের আক্রমণ থেকে সূর্যমুখী ফসলকে রক্ষা করা যায়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: বাংলাদেশে যে সমস্ত অঞ্চলে হোয়াইট মোল্ড বা সাদা ছত্রাক দ্বারা সূর্যমুখীর মাঠ আক্রান্ত হয় সব অঞ্চলেই প্রয়োগ করা যাবে।

প্রযুক্তির বর্ণনা: সূর্যমুখী একটি উৎকৃষ্ট তেল ফসল হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপক চাষ হয়। সূর্যমুখী রবি এবং খরিফ দুই মৌসুমেই বাংলাদেশে আবাদ হচ্ছে। বর্তমানে পটুয়াখালী, বাগেরহাট, যশোর, কুষ্টিয়া, নাটোর, পাবনা, দিনাজপুর, গাজীপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলাতে চাষাবাদ হয়। কিন্তু প্রতিকুল আবহাওয়ায় বিভিন্ন রোগ দ্বারা সূর্যমুখী আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে Sclerotinia sclerotiorum নামক ছত্রাক দ্বারা কান্ড ও ফুলে হোয়াইট মোল্ড বা সাদা ছত্রাক রোগ সৃষ্টি করে। এ ছত্রাক মৃত অথবা জীবন্ত উদ্ভিদে সাদা মাইসেলিয়া তৈরি করে এবং উদ্ভিদের আক্রান্ত অংশে ও মাটিতে কালোদানার স্কলেরোশিয়া তৈরি করে বেঁচে থাকে। সাধারণত ঠাণ্ডা তাপমাত্রা (১৫-২২০ সে.) এবং অধিক আর্দ্রতায় (৯০-৯৫%) বায়ু প্রবাহের ফলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

রোগের লক্ষণ

- প্রাথমিক অবস্থায় গাছের কাণ্ড ও ফুলে পানি ভেজা দাগ পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্তীতে তুলার মত সাদা মাইসেলিয়া সৃষ্টি করে ।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কান্ড বিবর্ণ হয়ে যায় এবং টিস্যু মারা যায় ও কাণ্ড ভেঙ্গে পরে যায়।
- আক্রান্ত ফুল (হেড) পচে নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত ফুলের উপরে ও কাণ্ডের মাঝে শক্ত কালো স্কলেরোশিয়া সৃষ্টি হয়। স্কলেরোশিয়া অনেক সময় কাণ্ডের উপরে দেখতে পাওয়া যায়।

প্রতিকার: এ রোগ থেকে প্রতিকারের জন্য সূর্যমুখীর বীজ দেরীতে বপন করতে হবে। নভেম্বরের ২০ তারিখ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে সূর্যমুখীর বীজ বপন করতে হবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সূর্যমুখীর হোয়াইট মোল্ড রোগ ৮০-৮৫% দমন হয় ও ফলন ৩ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানী নির্ভরতা কমে আসবে।

হোয়াইট মোল্ড আক্রান্ত ফুল

হোয়াইট মোল্ড আক্রান্ত কাণ্ড

নভেম্বরের ০১ তারিখে বপন

নভেম্বরের ২০ তারিখে বপন

প্রযুক্তি: আগাছানাশক দ্বারা বিনা চাষে জাবড়া (মালচিং) প্রয়োগের মাধ্যমে রসুন আবাদে আগাছা দমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- বৃহত্তর রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলায় মোট ২০,০০০ হেক্টর জমিতে বিনা চাষে জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে রসুন আবাদ করা হয় যেখানে আগাছা দমন একটি বড় অন্তরায়।
- গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে যে, বিনা চাষে জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে রসুন আবাদে Panida (Pendimethalin) এবং Ronstar (Oxadiazol) খুবই কার্যকরীভাবে আগাছা দমন করতে সক্ষম যা অর্থনৈতিক ক্ষতির মাত্রার অনেক নিচে থাকে।
- এ দুটি আগাছানাশক মোটামুটিভাবে ১১০ দিন থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে সক্ষম এবং ফলনে তেমন কোন প্রভাব পড়ে না।
- সুতরাং উল্লেখিত আগাছানাশক এর ব্যবহার কৃষক পর্যায়ে বিস্তার ঘটালে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: দেশের রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার চলন বিল ও নিচু অঞ্চলের ফসল ধারার জন্য উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহার পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

রোপণ সময়: নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ সময়কালে (কার্তিক মাসের শেষ থেকে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ) বিনা চাষে জাবড়া প্রয়োগের মাধ্যমে রসুন চাষের জন্য উপযুক্ত সময়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত অঞ্চল সমূহে পানি শুকানোর উপর রোপণ সময় ৫-৭ দিন বিলম্ব হতে পারে।

রোপণ/বপন পদ্ধতি: জলি আমন ধান (Deep water rice) কাটার পরপরই পানি সরে জমি শুকাতে শুরু করলে রসুন রোপণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৩৩৬-১৭৫-২৫০-২০০-৫.৬-৮ কেজি হারে (১৫৫-৩৫-১২৫-৩৬-২-১.৪ kgha-1 N-P-K-S-Zn-B) ইউরিয়া-টিএসপি-এমওপি-জিপসাম-জিংক সালফেট-বোরিক এসিড সার প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে, ইউরিয়া সারের এক তৃতিয়াংশ ও বাকি সমূদয় সার ভাল ভাবে কর্দমাক্ত জমির উপর ছিটিয়ে দিয়ে রসুনের কোয়াবীজ রোপণ করে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বাকি ২/৩ ভাগ ইউরিয়া রোপনের ২৫, ৫০ এবং ৭৫ দিন পর সেচ পরবর্তী উপরি প্রয়োগ করতে হবে। নির্বাচিত কোয়াবীজের মাত্র ১/৩ অংশ মাটির নিচে পুতে দিতে হবে। বিনা চাষে রসুন উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য ১৫ সেমি (৬ ইঞ্চি) × ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগাতে হবে।

আগাছানাশক প্রয়োগ পদ্ধতি: রসুনের কোয়াবীজ রোপনের ২৪ ঘন্টা পূর্বে অথবা রোপণের পরপরই কর্দমাক্ত মাটির উপরে উক্ত আগাছানাশক দুটি প্রয়োগের মাধ্যমে

সাফল্যজনকভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে, Panida (Pendimethalin) প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি এবং Ronstar (Oxadiazol) প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে।

জাবড়া প্রয়োগ (মালচিং): কোয়াবীজ রোপণের পর পরই একর প্রতি ২২২৫-২৪২৫ কেজি হারে (৩-৪ সেমি পুরুত্বে) জলি আমন ধানের খড় জমিতে সমান ভাবে বিছিয়ে কোয়াবীজ ঢেকে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা-মাকড় দমন: পারপল বচ (পাতা ঝলসানো) রোগ রসুনের সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ। এক্ষেত্রে রোভরাল ৫০ ডব্লিউ পি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে মিশিয়ে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। অপরদিকে রসুন ক্ষেতে তেমন পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না। তবে মাঝে মাঝে থ্রিপস (চুষি পোকা) ও জাবপোকা আক্রমণ দেখা যায়। এক্ষেত্রে পোকা দমনের জন্য ক্যরাটে অথবা এডমায়ার এর যে কোন একটি কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ অথবা ১ মিলি হারে মিশিয়ে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: সাধারণত কোয়াবীজ রোপণের ৬০-৬৫ দিনে কন্দ গঠন হতে শুরু করে এবং প্রায় ৯৫-১১০ দিনে কন্দ পুষ্ট হতে থাকে এবং ১৩০-১৪০ দিনে বীজ রসুন উঠানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় গাছের পাতা হলদে বাদামী রং ধারণ করে। গাছ আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারা যায়। কন্দের বাহিরের কোয়াগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং কোয়ার মাঝে খাঁজ দৃষ্টিগোচর হয়। উঠানো কন্দগুলি ৫-৬ দিন ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। অতঃপর সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন/ প্রাপ্তি: বাজার মূল্য হিসেবে দেখা যায় Panida (Pendimethalin) Ges Ronstar (Oxadiazol) এর মাধ্যমে আগাছা দমন করে বিনা চাষে রসুন উৎপাদন করলে অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভ হয়। এতে প্রতি হেক্টরে প্রকৃত মুনাফা হবে যথাক্রমে ৩,৮৯,৮৫০ এবং ৩,৫৮,৭০০ টাকা এবং প্রতি এক টাকা খরচ করে আয় হবে যথাক্রমে ২.৯৬ এবং ২.৮১ টাকা।

Panida (Pendimethalin) এবং আগাছানাশকবিহীন (No weedicide) প্লটের তুলনামূলক চিত্র (রসুন রোপণের ১২০ দিন পর)

Ronstar (Oxadiazol) এবং আগাছানাশকবিহীন (No weedicide) প্লটের তুলনামূলক চিত্র (রসুন রোপণের ১২০ দিন পর)

প্রযুক্তি: জাল (Net) ব্যবহার করে ফসলের পাখি তড়ানো

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পাখির যে কোন ফসলকে রক্ষা যায়।
- এই পদ্ধতিতে মানুষ বা অন্য কোন উপকারী প্রাণীর ক্ষতি হয় না অর্থাৎ এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি।
- এটি অত্যন্ত সহজ এবং সহজলভ্য পদ্ধতি
- ইহা একটি পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি

উপযোগিতা: গম ক্ষেতে শালিক পাখির উপদ্রব হয়। বীজ বুনার ৫/৬ দিন পর গমের অঙ্কুর বের হয়। কোন কোন এলাকায় শালিক পাখি এ অঙ্কুরিত গম বীজ তুলে খেয়ে ফেলে। পাকা টমেটো ক্ষেতেও পাখির উপদ্রব হয়। ভুট্টা ক্ষেতে টিয়া ও কাকের উপদ্রব হয়। এরা ভুট্টার মোচা খেয়ে ফেলে ফসলের ক্ষতি করে। তেমনি ভাবে সূর্যমুখী ক্ষেতে ও কাক টিয়া পাখি পরিপক্ক বীজ খেয়ে ফেলে। যেহেতু এসব পাখি ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি যথেষ্ট উপকারও করে থাকে তাই পাখিকে না মেরে ফসলের ক্ষেত থেকে তাড়িয়ে ফসল রক্ষা করাই একমাত্র উপায়। এই পদ্ধতিটি মাঠ ফসলের যেখানে পাখির অক্রমণ আছে, সেখানেই ব্যবহার যোগ্য। বাংলাদেশের সব এলাকায়, সারা বছর ব্যবহার উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহার পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইহা একটি কার্যকর পাখি তাড়ানোর পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ফসলের চারা ও পরিপক্ক অবস্থায়ব্যবহার করা যায়। ফসলে এটি দুই ভাবে ব্যবহার করা যায়। সম্পূর্ণ ফসলের মাঠ নেট বা জাল দিয়ে ঢেকে দিয়ে অথবা শুধু ফসলের উপরিভাগ নেট দিয়ে ঢেকে। সম্পূর্ণ মাঠ ঢেকে দিলে ফসলে পাখির দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না। শুধু উপরিভাগ নেট দিয়ে ঢেকে দিয়েও অর্থনৈতিক ভাবে পাখির ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমানো যায়। ফসলে ফল/দানা অসার পরপরই গাছের এক ফুট উপরে জাল টানিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে এক মেস বা এর নীচে জাল ব্যবহার করা ভালো, এতে পাখি আটকে যাওয়ার সম্ভবনা কম থাকে। যত্ন করে রাখলে এই নেট কয়েক বছর ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তি হতে প্রাপ্তি: এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলভাবে পাখির ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষা করা যাবে। কোন বিষ ব্যবহার না করে নিরাপদে, কম খরচে পাখি তাড়ানো সম্ভব হবে। এ পদ্ধতিতে প্রায় ৭০-১০০ ভাগ পর্যন্ত কার্যকর ভাবে পাখি তাড়ানো যাবে।

প্রযুক্তির প্রভাব: মানব স্বাস্থ্য, মাটি ও পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না। সমন্বিত ও পরিবেশসম্মতভাবে পাখি ব্যবস্থাপনার একটি উপায় হিসাবে এটি ব্যবহার করা যাবে।

সম্পূর্ণ ফসল নেট দিয়ে ঢেকে

শুধু উপরিভাগ নেট দিয়ে ঢেকে

প্রযুক্তি: কাঁচা আমের ভ্যাকুয়াম ফ্রাইড চিপস্ তৈরিকরণ

আম আমাদের দেশে অন্যতম একটি জনপ্রিয় ফল। স্বাদ, গন্ধ ও রসালো হওয়ায় দেশের আপামর জনসাধারণ এটি কাঁচা ও পাকা উভয় ভাবেই খেতে পছন্দ করে। এটি ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসহ অন্যান্য পুষ্টিতে ভরপুর একটি ফল। প্রতিবছর ঝড়, শিলা বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগে প্রচুর পরিমাণে আম ঝরে পড়ে। ফলে আম উৎপাদনকারী কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমের সংগ্রহোত্তর অপচয় শতকরা ২৫-৩৫ ভাগ বা অনেক সময় এর বেশি হয়ে থাকে। অপরিপক্ক আম বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না বিধায় উৎপাদনকারী কৃষক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে থাকেন। তবে স্টিপিং পদ্ধতিতে কাঁচা আম ৬-৮ মাস সংরক্ষণ করা যায় এবং সহজেই প্রক্রিয়াজাত করে মূল্য সংযোজন করা সম্ভব। ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচা আমের চিপস্ সারা বছর সরাসরি ও সংরক্ষণকৃত কাঁচা আম ব্যবহার করে তৈরি যায় যা নিংসন্দেহে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং পদ্ধতিতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে (১১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) পণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী (৫০-৬০ মিনিট/কেজি) গুণগতমান সম্পন্ন কাঁচা আমের চিপ্স তৈরি করা যায়।
- প্রযুক্তিটি প্রয়োগের মাধ্যমে কাঁচা আমের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানো যাবে এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করবে।
- কাঁচা আম সংরক্ষণের মাধ্যমে সহজেই সারা বছর চিপস্ তৈরি করা যাবে ও ফয়েল মোড়কে ৪-৬ মাস পর্যন্ত স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

উপযোগি এলাকা: আম উৎপাদনকারী সকল এলাকা ।

প্রযুক্তির উপযোগিতা:সকল পর্যায়ের উদ্যোক্তা বিশেষত: নারী উদ্যোক্তা, উপকারভোগী ব্যক্তিগণ ও কৃষিপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিটি সহজেই ব্যবহার করতে পারবে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: অপরিপক্ক ও কাঁচা আম স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না কিন্তু কাঁচা আম সহজেই প্রক্রিয়াজাত করে মূল্য সংযোজন করা যায়। কাঁচা আম সরাসরি ও স্টিপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণকৃত কাঁচা আম দিয়ে ভ্যাকুয়াম ফ্রাইং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চিপস্ তৈরি করা যায় যা আমের অপচয় কমাবে এবং মুখরোচক খাবার হিসেবে বছরব্যাপী উদ্যোক্তা ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান কাঁচা আমের চিপস্ তৈরি করে বাজারজাত করতে পারবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: প্রতি কেজি কাঁচা আমের কোষ/টুকরো থেকে ৩০০-৩৫০ গ্রাম ভ্যাকুয়াম ফ্রাইড চিপস্ পাওয়া যায়।

প্রযুক্তির প্রভাব: আয় বাড়াতে ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করবে। মানব স্বাস্থ্য, মাটি ও পরিবেশের উপর উলেখ্যযোগ্য কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই।

ভ্যাকুয়াম ফ্রাইড কাঁচা আমের চিপস্ তৈরিকরণ পদ্ধতি

প্রযুক্তি: এনজাইম নিষক্রিয়করণের মাধ্যমে মুখীকচুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ

মুখীকচু একটি উল্লেখযোগ্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় মূল জাতীয় ফসল যা বাংলাদেশে এর পুষ্টিগুণ এবং রন্ধনসম্পর্কিত বহুমুখী ব্যবহারের কারণে বর্তমানে ব্যাপকভাবে চাষ করা হচ্ছে। সতেজ মুখীকচুর শিকড় পচনশীল হওয়ায় এটি সংরক্ষণ এবং বিপণন করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মুখীকচু একটি শ্বেতসারযুক্ত ফসল। এটি কার্বোহাইড্রেটের অন্যতম প্রধান উৎস। প্রতি ১০০ গ্রাম মুখীকচু থেকে ২৬৬ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি পাওয়া যায়। তাছাড়া নানাবিধ পুষ্টিগুণ যেমন খনিজ পদার্থ, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ক্যারোটিন, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও শকব্রা ইত্যাদি রয়েছে। এটি রক্তে শকব্রার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি কমায়। সংরক্ষণকৃত মুখীকচু শীতলীকরণ (ফ্রোজেন) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বছরব্যাপী ব্যবহার করা সম্ভব যা পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা ও আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- মুখীকচুর গুণাগুণ বজায় রেখে উৎপাদন মৌসুমের পরেও দেশের সকল অঞ্চলে অধিক সময় মুখীকচু বাজারজাতকরণ সম্ভব হবে।
- কৃষক পর্যায় হতে ব্যবসায়ী পর্যন্ত সকলেই এ পদ্ধতিতে মুখীকচু সংরক্ষণ ও বিক্রয় করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারবেন এবং সকল ভোক্তা বছরব্যাপী রেডি-টু-কুক পণ্য হিসেবে মুখীকচুর স্বাদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।
- বিদেশেও রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে সম্ভাবনা রয়েছে।

উপযোগি এলাকা: মুখীকচু উৎপাদনকারী সকল এলাকা ।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: সকল পর্যায়ের উদ্যোক্তা বিশেষত: নারী উদ্যোক্তা, উপকারভোগী ব্যক্তিগণ ও কৃষিপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিটি সহজেই ব্যবহার করতে পারবে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট: সহজেই প্রক্রিয়াজাত করে মূল্য সংযোজন করা ও বছরব্যাপী সংরক্ষণ ও বিপণনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য/মাঠ পর্যায়ের তথ্য: সারাদেশের বিভিন্ন এলাকার খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তাদের হাতেকলমে প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: প্রতি কেজি মুখীকচু থেকে ৭০০-৮০০ গ্রাম রেডি-টু-কুক পণ্য হিসেবে মুখীকচু পাওয়া যায়।

প্রযুক্তির প্রভাব: আয় বাড়াতে ও কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করবে এবং মানব স্বাস্থ্য, মাটি ও পরিবেশের উপর উল্লেখ্যযোগ্য কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই।

রেডি-টু-কুক পণ্য হিসেবে মুখীকচু প্রক্রিয়াজাতকরণ

প্রযুক্তি: পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে সূর্যমুখী সারির প্রভাব

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: পরাগায়নের ক্ষেত্রে পোকামাকড় সাধারণত সবচেয়ে কার্যকারী উপাদান হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ফরিদপুরে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, পরাগায়নকারীর প্রচুর্যকম, যার ফলে বীজ উৎপাদন কম হয়। পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে মৌমাছিকে আকর্ষণ করার জন্য সূর্যমুখীর মতো মূল্যবান এবং স্বাস্থ্যকর তেলযুক্ত ফসলকে পেঁয়াজের সাথে সীমানা বা সারি ফসল হিসেবে প্রবর্তন করা যেতে পারে। সূর্যমুখীর ঘন হলুদ পাপড়িতে অতিবেগুনী রঙ পরাগায়নকারীদের আকর্ষণ করে এবং উন্নত বীজ উৎপাদনের জন্য পরাগায়নে সহায়তা করে। তাই সূর্যমুখী পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে সীমানা বা সারি ফসল হিসেবে ব্যবহার করে অধিক পরাগায়নের মাধ্যমে ফলন বাড়ানো সম্ভব।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: অঞ্চল: ফরিদপুর ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১২ এর অনুরুপ অঞ্চল।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য: **ফসল-** পেঁয়াজ ও সূর্যমুখী। **জাত-** বারিপেঁয়াজ-৪ এবং বারি সূর্যমুখী-৩।

বপন/রোপণের দূরত্ব (সেমি): ১০ সারি পেঁয়াজের পর ১ সারি সূর্যমুখী।

সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)

সারেরনাম	পেঁয়াজ	সূর্যমুখী
ইউরিয়া	৩৪৭	১৮৮
টিএসপি	৩০০	১৭০
এমওপি	১২০	১৬০
জিমসাম	৮৪	৮০
জিংকসালফেট	১৭	২২
বোরন	৮.৮	১১

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পেঁয়াজ: সকল টিএসপি, এমওপি, জিবসাম, বোরন ও অর্ধেক ইউরিয়া , সার চূড়ান্ত জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাক ইউরিয়া সার বপনের ২৫ ও ৫০ দিন পর উপযুক্ত আর্দ্র মাটিতে সমান দুই ভাগে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সূর্যমুখী: এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিবসাম ও বোরন সার চূড়ান্ত জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সার বপনের ৩০ ও ৫৫ দিন পর উপযুক্ত আর্দ্র মাটিতে সমান দুইভাগে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলেরঅন্ত: পরিচর্যা: গাছের বৃদ্ধি ও অধিক ফলন পাওয়ার জন্য রোপণের ২৮-৩০ দিন পর আগাছা দমন ও মালচিং করতে হবে। রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর গোঁড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: পেঁয়াজ ও সূর্যমুখী রোপণের পর সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন: রোগবালাই দমনের জন্য রোপণের ২০-২৫ দিন পর থেকে ০৭-১০ দিন অন্তর অন্তর রোভরাল, এমিস্টার টপ ছত্রাকনাশক৫-৭ বার স্প্রে করতে হবে। পোকা মাকড় দমনের জন্য ১০ দিন অন্তর অন্তর ইমিটাফ ও একতারা ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: সাধারণ লাগানোর ১৩৪-১৩৭ দিনের মধ্যে বীজ সংগ্রহ করা যায়।

প্রযুক্তি হতে ফলন: ৩৫০ কেজি/হেক্টর

লাভ ক্ষতির বিবরণ: মোটআয় = ২১০৪২০০ টাকা/হেক্টর

উৎপাদনব্যয় = ২২৩০৮০ টাকা/হেক্টর

মোটমুনাফা = ১৮৮১১২০ টাকা/হেক্টর

পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে সূর্যমুখী সারির মাঠের স্থিরচিত্র

১০ সারি পেঁয়াজের পর ১ সারি সূর্যমুখীর লাইন

প্রযুক্তি: বাংলাদেশের পতিত-পতিত-রোপা আমন এবং পতিত-আউশ-রোপা আমন বিন্যাসে 'বারি আলু-৪১' জাতের অন্তর্ভুক্তিকরণ

বাংলাদেশে পতিত-পতিত-রোপা আমন এবং পতিত-আউশ-রোপা আমনে ফসল বিন্যাসের আওতায় প্রায় ৭ মিলিয়ন হেক্টর জমি রয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল, চরাঞ্চল এবং হাওড় অঞ্চলের জমি বিভিন্ন ফসলের উপযোগী বিএআরআই উদ্ভাবিত জাত নির্বাচনের মাধ্যমে আবাদের আওতায় এনে দেশের মোট কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আলু একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে সাধারণত আলু রোপণের উপযুক্ত সময় হলো অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। তবে অঞ্চলভেদে এবং আবহাওয়া অনুযায়ী এ সময় কিছুটা পরিবর্তিত হয়। অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আলু রোপণ করলে গাছের বৃদ্ধি ও কন্দ গঠন ভালো হয়, ফলে ফলন বেশি হয়। তবে রোপণের সময় পিছিয়ে গেলে ফলন কিছুটা কমে যায়। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৪১' জাতের আলু দেরীতে বপন করা হলেও এ জাতটি ভাল ফলন দিতে সক্ষম। দেশের দক্ষিণাঞ্চল, চরাঞ্চল এবং হাওড় অঞ্চলের জমিতে আমন ধান কর্তন শেষে ঐ সমস্ত জমিতে পরবর্তী ফসল ফলানোর জন্য জো-আসতে একটু বেশী সময় লাগে বিধায় জমি পতিত থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে 'বারি আলু-৪১' জাতের আলুর চাষের মাধ্যমে জমির উত্তম ব্যবহার করে দেশের মোট আলু উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তির উপকারিতা: উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউ এর উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ চারটি রোপণ সময় (২০ নভেম্বর, ৩০ নভেম্বর, ১০ ডিসেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর)

নিয়ে 'বারি আলু-২৫' ও 'বারি আলু-৪১' জাতের ফলন ও জীবনকালের ওপর মাঠ পর্যায়ে লাগাতার দুই বছর (২০২২-২৩ও ২০২৩-২৪) গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন রোপণ সময় ও জাতভেদে আলুর ফলন ও জীবনকাল বিশ্লেষণ করা এবং শস্য বিন্যাস বিবেচনায় জমির উত্তম ব্যবহার করে যাতে কৃষকরা সর্বোত্তম ফলন পেতে পারেন এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন। দুই বছরের গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ২০ নভেম্বর ও ৩০ নভেম্বরে রোপিত 'বারি আলু-৪১' জাতের ফলন হয়েছিল যথাক্রমে ৩৫.০ ও ৩৪.০ টন/হেক্টর এবং ১০ ডিসেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর রোপিত ঐ জাতটির ফলন হয়েছিল যথাক্রমে ২৯.৫ টন/হেক্টর ও ২৭ টন/হেক্টর (সারণী ১), যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বারি আলু-৪১' জাতটি দেরিতে রোপণেও অধিক ফলন দিতে সক্ষম। 'বারি আলু-২৫' জাতের দেরিতে রোপণে 'বারি আলু-৪১' জাত অপেক্ষা কম ফলন দিয়েছিল। সুতরাং 'বারি আলু-৪১' দেরিতে রোপন সহনশীল ও ভাল ফলন দিতে সক্ষম। 'বারি আলু-৪১' জাতটি দেরিতে রোপণ করলেও তুলনামূলকভাবে ফলন দিতে সক্ষম বিধায় পতিত-পতিত-রোপা আমন ও পতিত-আউশ-রোপা আমনে শস্য বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করে দেশজ মোট আলু উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী ১: বিভিন্ন রোপন তারিখে 'বারি আলু-২৫' ও 'বারি আলু-৪১' জাতের ফলন ও জীবনকালের (গড়) তুলনামূলক বিশ্লেষণ

রোপনের তারিখ	বারি আলু-২৫ (ফলন) (টন/হেক্টর)	বারি আলু-২৫ (জীবনকাল)	বারি আলু-৪১ (ফলন)	বারি আলু-৪১ (জীবনকাল)
২০ নভেম্বর	২৬.০	৯১	৩৫	১০০
৩০ নভেম্বর	২৪.০	৮৬	৩৪	৯৬
১০ ডিসেম্বর	২১.০	৮০	২৯.৫	৮৫
২০ ডিসেম্বর	২০.০	৭৬	২৭	৮১

বারি আলু-২৫ এর অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় (ইনসেটে কন্দ)

বারি আলু-৪১ এর অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায় (ইনসেটে কন্দ)

প্রযুক্তি: বেগুনের ক্ষতিকর লাল মাকড় এর জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা

ক্ষতিকর লাল মাকড়, *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) এর আক্রমণ আমাদের দেশে বেগুন ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এই মাকড় প্রধানত গাছের পাতার রস চুষে খায় ফলে ফসলের বৃদ্ধি রহিত হয় এবং উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে কমে যায়। ক্ষতিকর মাকড় বেগুনের জন্য একটি উদ্বেগজনক বালাই হয়ে দাঁড়িয়েছে যার আক্রমণ ফেব্রুয়ারি মাসে বৃদ্ধি পায় এবং জুলাই মাসে হ্রাস পায়। তাই, আমাদের দেশে বেগুনের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এই ধ্বংসাত্মক বালাইয়ের বিরুদ্ধে পরিবেশ বান্ধব টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করা প্রয়োজন।

ক্ষতিকর মাকড় আক্রমণের প্রথম লক্ষণ সাধারণত পাতায় হলদেটে বা ধূসর ছাপের মতো দেখা যায়, যদিও এটি ঘন পাতাযুক্ত গাছগুলিতে তেমন স্পষ্ট নাও হতে পারে। মাকড় গুলি যখন পাতার নিচের অংশে খায়, তখন তারা পাতার কোষের উপাদান, বিশেষ করে ক্লোরোফিল যা পাতার সবুজ রঙ দেয়, তা শোষণ করে ফেলে। ক্লোরোফিল না থাকায়, ওই কোষগুলি সাদাটে বা তামাটে রঙের হয়ে যায়। আক্রমণ গুরুতর হলে পাতাগুলি পুরোপুরি ফিকে হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

উক্ত সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট রাসায়নিক মাকড়নাশকের বিকল্প হিসেবে জৈবিক দমন পদ্ধতি বিশেষ করে উপকারী মাকড় *(Neoseiulus longispinosus)* ব্যবহার এর মাধ্যমে উক্ত ক্ষতিকর মাকড়গুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন ফসলের লাল মাকড় পরিবেশ সম্মত উপায়ে সফল ভাবে দমন করা সম্ভব।

প্রযুক্তির বর্ণনা

১। উপকারী মাকড় অবমুক্ত করা: মাকড় আক্রান্ত বেগুনের জমিতে প্রয়োজন মাফিক উপকারী মাকড় (নিউসেইলাস প্রজাতির) প্রতি হেক্টরে ৫০০টি অবমুক্ত করতে হবে। বেগুনের জমিতে উপকারী মাকড় সাধারণত ২ বার অবমুক্ত করা প্রয়োজন হয়।

২। জৈব মাকড়নাশক প্রয়োগ: জৈব মাকড়নাশক যেমন কে-মাইট প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে প্রয়োজন মাফিক স্প্রে করতে হবে। সাধারণত ২ বার জৈব মাকড়নাশক প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। জৈব মাকড় নাশক স্প্রে ও উপকারি মাকড় অবমুক্ত করার মধ্যে কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ব্যবধান থাকতে হবে।

ক্ষতিকর লাল মাকড় আক্রান্ত বেগুন ফসল।

উপকারী মাকড়।

বেগুনের জমিতে উপকারী মাকড়ের অবমুক্তকরণ

প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী।

প্রযুক্তির উপকারিতা: প্রযুক্তিটি ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুন ফসলে ক্ষতিকর মাকড়ের আক্রমণ শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। এর মাধ্যমে রাসায়নিক বালাইনাশক মুক্ত বেগুন উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রযুক্তি: তরমুজের কাণ্ডের আঠা ঝরা রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

তরমুজের কাণ্ডের আঠা ঝরা বা Gummz Stem Blight রোগটি Didzmella brzoniae নামক ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে। এর ব্যাপক বিস্তার এবং ক্ষতির কারণে এই রোগটি বিশ্বব্যাপী তরমুজ চাষের জন্য যথেষ্ট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রোগটি গাছের পাতা, ডালপালা এবং ফল সহ গাছের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করে, যা উল্লেখযোগ্য পরিমান ফলনের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এই রোগের লক্ষণ ডালপালা এবং পাতায় গাঢ় ক্ষত হিসাবে প্রকাশ পায়, যার সাথে একটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত আঠালো রসবের হয় যার সাথে মিল রেখে রোগটির নাম রাখা হয়েছে। এই ক্ষতগুলি দ্রুত প্রসারিত হতে পারে। উষ্ণএবং আর্দ্র অবস্থায় তরমুজ উৎপাদনের জন্য অনুকূল আবহাওয়ায় বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

- প্রাথমিকভাবে গাছের কাণ্ড ও পাতায় ছোট ছোট পানি ভেজা হলুদ দাগ হয়।
- দাগগুলো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় ও কাণ্ড থেকে রস বের হয়।
- সমস্ত পাতা ও কাণ্ড শুকিয়ে যায়।
- গাছ পুরোপুরি মারা যায়।

সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- নতুন জমিতে তরমুজ চাষ করতে হবে যেখানে পূর্বে তরমুজ চাষ করা হয়নি।
- বায়ো-ফিউমিগেশন পদ্ধতিতে মাটি শোধনের জন্য বারি সরিষা-১১ অথবা বারি সরিষা-১৬ এর ২০-২১ দিনের চারা চাষের মাধ্যমে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- জমিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৭৫-১০০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।
- জমিতে উঁচু বেড তৈরি করে মালচিং পেপার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- বীজ সরাসরি মাঠে অথবা পলিব্যাগে বপনের পূর্বে প্রভেক্স-২০০ ডাব্লিউপি দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- বীজ রোপণ বা চারা বপনের ৩-৭ দিন পূর্বে এবং ১৫-২০ দিন পর ডেকোপ্রাইমা/বায়োডার্মা (ট্রাইকোডার্মা) জৈব ছত্রাক নাশক (৭৫০ গ্রাম/হেক্টর) মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ১০০ গ্রাম ডেকোপ্রাইমা ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৬-১২ ঘণ্টা কক্ষ তাপমাত্রায় রাখতে হবে। উক্ত মিশ্রণকে ৫০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। অথবা ট্রাইকো-কম্পোষ্ট ৬০-৯০ কেজি প্রতি হেক্টরে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- চারা রোপণের ২-৩ দিন পর থেকে ৭ দিন অন্তর অন্তর কমপ্যানিয়ন (মেনকোজেব ৬৩% + কার্বেন্ডাজিম ১২%) ৭৫ ডাব্লিউপি ২ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশেয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ক-সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগকৃত জমিতে সুস্থ্য তরমুজ গাছ এবং খ-প্রচলিত ব্যবস্থাপনা রোগাক্রান্ত তরমুজ গাছ।

প্রযুক্তি: মিঠা পানি এবং লবণাক্ত পানিরপর্যায়ক্রমিক সেচের মাধ্যমে উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ফসল উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় রবি ফসলের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে মিঠা পানি (কম লবণাক্ত: ০.৫ ≠ লবণাক্ততা < ২ ডিএস/মি) এবং লবণাক্ত পানি (মাঝারি লবণাক্ত: ২ < লবণাক্ততা < ৫ ডি এস/মি) পর্যায়ক্রমিক (মিঠা পানি + লবণাক্ত পানি+ মিঠা পানি + লবণাক্ত পানি) সেচের মাধ্যমে রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসল জন্মানোও শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করা যায়।
- রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসল যেমনঃ আলু, রসুন, তরমুজ, সূর্যমুখী, ভুট্টা, গম, এবং বার্লি ইত্যাদিতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঙ্খিত ফসল ও ফলন পাওয়া যায়।
- এই প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পতিত জমি ফসল চাষ করে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করার জন্য বিকল্প সেচ এবং কৌশল হতে পারে যা লবণাক্ত এলাকায় প্রতি বছর একটি ফসলের পরিবর্তে দুটি ফসল চাষ করা যেতে পারে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: বাংলাদেশের দক্ষিণে উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে যেখানে মিঠা পানির প্রাপ্যতা সীমিত, সে সব এলাকায় এই পদ্ধতি বিশেষ ভাবে উপযোগী। এই প্রযুক্তিটি পরিবেশ বান্ধব।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য

- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে অসংখ্য খাল ও পুকুর রয়েছে। উক্ত খাল ও পুকুরের পানি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা বিদ্যমান। খালগুলো নদীর সাথে সংযোগ থাকায় জোয়ারের সময় লোনা পানি প্রবেশ করে। আবার কিছু খাল গেইট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকায় জোয়ারের লোনা পানি প্রবেশ করতে পারে না। পুকুরে শুধুমাত্র বৃষ্টির পানি জমা থাকে। বর্ষাকালে জুলাই-আগস্ট মাসে পানি ও ফসলের জমির লবণাক্ততা সবচেয়ে কম থাকে। পরবর্তী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকে বৃদ্ধি পেয়ে লবণাক্ততা মার্চ-এপ্রিলে সবচেয়ে বেশী হয়।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষিত পুকুরের পানির লবণাক্ততা ০.৫ ডিএস/মি হতে ২ ডিএস/মি বা তার কাছাকাছি থাকে এবং নিয়ন্ত্রিত খালের বৃষ্টির পানি ০.৫ ডিএস/মি হতে ৫ ডিএস/মি বা তার কাছাকাছি মাত্রায় থাকে।
- রবি মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় লবণাক্ততা বেড়ে যায় ফলে সেচ উপযোগী মিঠা পানির ঘাটতি দেখা যায়। রবি মৌসুমে সেচ ছাড়া ভাল ফলন আশা করা

যায় না। মিঠা পানির খাটতিজনিত কারণে শুধুমাত্র খালের মাঝারি লবণ মাত্রার লোনা পানি ব্যবহার করলে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায় না।

- গবেষণায় দেখা যায় যে, পর্যায়ক্রমিক মিঠা পানি (উৎস: পুকুর বা নিয়ন্ত্রিত খাল) ও দ্বিতীয় সেচ লোনা পানি (উৎসঃ মাঝারি লবণানাক্ততা পানি) এবং তৃতীয় সেচ পুনরায় মিঠা পানি ইত্যাদি চক্রাকার বা পর্যায়ক্রমিক সেচের মাধ্যমে রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসল চাষে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায়।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আমন ফসলের পরে রবি শস্য চাষের জন্য সম্ভাবনাময়য় এই প্রযুক্তি ব্যবহারে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব এবং কৃষক অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে।
- সেচের পানি বাস্পায়ন জনিত কারণে অপচয় রোধকল্পে ফসলের জমিতে সেচ সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া, প্রচন্ড তাপমাত্রার রৌদ্রের সময় ফসলের জমিতে যাতে সেচ দেয়া না হয় সেদিকে সতর্ক অবলম্বন উচিৎ।

প্রযুক্তিহতেফলন/প্রাপ্তি

- বাংলাদেশের উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় রবি মৌসুমে মিঠা পানির অভাবে জমি পতিত থাকে। ফলে শুধুমাত্র লোনা পানি ব্যবহার না করে পর্যায়ক্রমিক বা চক্রাকার সেচ পদ্ধতিতে চাষ করলে বছরে একের অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- উক্ত সেচ পদ্ধতিতেআপেক্ষিক ফলন শতকরা ৮০-৯০ ভাগ পাওয়া সম্ভব।
- উপকূলীয় পতিত জমিতে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে রবি মৌসুমে ফসল উৎপাদন করে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে।

উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় মিঠা পানি এবং লবণাক্ত পানির পর্যায়ক্রমিক সেচের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ফটোগ্রাফিক দৃশ্য।

প্রযুক্তি: মাটির কার্বন সমৃদ্ধকরণ ও ব্রোকলির ফলন বৃদ্ধিকরণে জৈব বর্জ্য থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট এর ব্যবহার।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- জৈব বর্জ্য রিসাইকেল হওয়ায় পরিবেশ দূষণে সহায়ক।
- কার্বনের পরিমাণ বেশি।
- উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ।
- মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পরিশোষনে সহায়ক।
- মাটির অম্লতা কমাতে ও বিষাক্ততা দূরীকরনে সহায়ক।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: সকল অঊত ও সারা বছর ব্যবহারযোগ্য তবে যে সকল অঞ্চলে মাটির অম্লতা পরিলক্ষিত হয় অথ্যাৎ পিএইচ ৫.৫ বা তার নিচে সে সকল অঞ্চলে ফসল উৎপাদনে জৈব বর্জ্য থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট সবচেয়ে বেশি উপযোগী কারন কম্পোস্ট প্রয়োগে মাটির অম্তা দূরীকরণের পাশাপাশি বিষাক্ত ধাতুর দূষণ থেকে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান গ্রহণ ত্বরান্বিতকরণ ও ফসলের গুণগতমান সমোন্বীত রাখতে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের তথ্য

ফসলের নাম: ব্রোকলি (গ্রীন ক্রাউন)

বপন সময়: ৩০-১১-২০২১ খ্রি.।

সারের মাত্রা ও পদ্ধতি: গাজীপুরের ধূষর লাল মাটিতে জৈব বর্জ্য থেকে উৎপাদিত কম্পোস্ট ব্যবহার করে মাটির কার্বন স্টক, উব্রতা ও ব্রোকলির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। এইক্ষেত্রে ১০০% অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের (নাইট্রোজেন ৯৩, ফসফরাস ২৪, পটাশিয়াম ৫৫, সালফার ১৪ এবং বোরন ১.৩ কেজি/হেক্টর) সাথে হেক্টর প্রতি ৫ টন কম্পোস্ট প্রয়োগ করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সার ব্যবস্থাপনায় হেক্টর প্রতি ২.৫ টন কম্পোস্ট, ফসফরাস ১২০ কেজি, জিপসাম ৭৮ কেজি, বোরিক এসিড ৮ কেজি জমির শেষ চাষের সময় মাটিতে মেশানো হয়। চারা লাগানোর ১৫, ৩০ এবং ৫০ দিনে ১/৩ ভাগ (৬৭ কেজি নাইট্রোজেন), পটাশিয়াম ১/৩ ভাগ (৩০ কেজি) হিসাবে তিনবার গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া অর্ধেক পরিমাণ কম্পোস্ট (২.৫ টন/হেক্টর) চারা লাগানোর সময় গর্তে প্রয়োগ করা হয়।

সেচ: সবজি ফসল হিসাবে ব্রোকলির পানি চাহিদা বেশি হওয়ায় ৫ দিন অন্তর অন্তর সেচ প্রয়োগ করা হয়।

আগাছা দমন ও আগাছা রোগ ও পোকা দমন: প্রয়োগকৃত সারের অপচয় রোধ করতে মাঠকে আগাছামুক্ত রাখা হয়।

ফসল কর্তন: ৩১ জানুয়ারি হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি: সমন্বীত সার ব্যবস্থাপনায় ব্রোকলির গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ১৫.৪০ টন পাওয়া যায়। যা রাসায়নিক সার ব্যবহারের থেকে ৩০% বেশি। এছাড়া মাটির কার্বন স্টক ৭% ফসফরাস ২০% এবং পটশিয়াম ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। যা লাগসই কৃষি প্রযুক্তিকে ইঙ্গিত করে।

প্রযুক্তি: পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ রোগ দমনের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

পেঁয়াজ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মসলাজাতীয় ফসল। পেঁয়াজ উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে পেঁয়াজের ফলন অনেক কম। রোগবালাই পেঁয়াজের ফলন কম হওয়ার অন্যতম কারণ। পার্পল ব্লচ পেঁয়াজের একটি প্রধান রোগ। এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। অলটারনারিয়া পরি (Alternaria porri) ও স্টেমফাইলিয়াম (Stemphzlium sp.) নামক ছত্রাক দিয়ে এ রোগ হয়। রোগক্রান্ত বীজ, বায়ু ও গাছের পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। অধিক তাপমাত্রা, অতিরিক্ত শিশির, আর্দ্র আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত হলে এ রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

রোগের লক্ষণল

- প্রথমে পাতা ও মঞ্জুরী দণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি ভেজা হলুদ বা বাদামী রঙের দাগ সৃষ্টি হয়।

- দাগগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে বড় দাগে পরিণত হয় এবং চক্রাকারে কালো রিংয়ের মত দাগ হয়।
- দাগের মধ্যবর্তী অংশ প্রথমে লালচে বাদামী ও পরবর্তীতে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং দাগের কিনারা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে।
- আক্রান্ত পাতা উপরের দিক হতে ক্রমান্বয়ে মরে যেতে থাকে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত পাতা ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে হলদে হয়ে মরে যায়। পেঁয়াজের কন্দ ছোট হয় বেং কন্দ পেঁয়াজের ফলন হ্রাস পায়।
- ফুল বা বীজবাহী দণ্ডে আক্রান্ত স্থানে দাগ বৃদ্ধি পেয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে।
- এ রোগের আক্রমণের ফলে বীজ অপুষ্ট হয় এবং ফলন হ্রাস পায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- শস্য পর্যায় অনুসরন করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।
- সুস্থ বীজ ও চারা ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছের অবশিষ্ট অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.৫ গ্রাম হারে প্রোভেক্স-২০০ (কার্বোক্সিন ১৭.৫% + থিরাম ১৭.৫%) বা অটোস্টিন (কার্বেন্ডাজিম) মিশিয়ে বীজ শোধন করে মাটিতে বীজ বপন করতে হবে।
- রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে লুনা সেনসেশন (ফ্লুপাইরাম ২৫% + ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রবিন ২৫%) ১ মিলি অথবা এমিস্টার টপ (অ্যাজোক্সিস্ট্রবিন ২০% + ডাইফেনোকোনাজল ৮%) ১ মিলি অথবা রোভরাল (ইপ্রোডিওন ৫০%) + রিডোমিল ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৪-৫ বার স্প্রে করতে হবে।

ক-রোগমুক্ত পেঁয়াজ গাছ, খ-রোগাক্রান্ত পেঁয়াজ গাছ।

প্রযুক্তি: ফালি পদ্ধতিতে ভুট্টার সাথে মটরশুটি চাষ

ফালি আন্তঃফসল (Strip intercropping): বড় বড় ফালিতে বিভিন্ন ফসল এক সাথে আবাদ করাকে স্ট্রিপ ক্রপিং বলে। স্ট্রিপ ক্রপিং হল একটি ফলপ্রসূ কৃষি অনুশীলন যা শুধুমাত্র ক্রমবর্ধমান ফলন ছাড়াও অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করে। বিশেষ করে ঢালু জমিতে, মাটির ক্ষয় কমাতে স্ট্রিপ ক্রপিং ব্যবহার করা কার্যকর প্রমাণিত হয়। সঠিকভাবে নির্বাচিত ফসল একে অপরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে, এইভাবে ক্ষেতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। বায়ু এবং জলের ক্ষয় মোকাবেলা করে; মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখে; নাইট্রোজেন স্থিরকরণে অংশগ্রহণ করে; পরাগায়নকারীদের আকর্ষণ করে; কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে মাটির স্বাস্থ্য এবং উর্বরতা বৃদ্ধি করে; ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি। হাইব্রিড ভুট্টার সাথে আন্তঃফসল হিসেবে স্বল্প মেয়াদী খাটো আকৃতির বিভিন্ন ফসল আবাদ করা যায়। আন্তঃফসলের মত ভুট্টার সাথে ফালি পদ্ধতিতেও স্বল্প মেয়াদী খাটো আকৃতির বিভিন্ন ফসল আবাদ করা যায়। ফালি পদ্ধতিতে স্বল্প মেয়াদী সবজী যেমন- মটরশুটি চাষ করলে ভুট্টার ফলন তেমন একটা কমে না। উপরন্তু আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। এছাড়াও একটি ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হলেও আরেকটি ফসল পাওয়া যেতে পারে। মটরশুটি একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর শীতকালীন সবজি। লিগিউম জাতীয় ফসল হওয়ায় আন্তঃফসল হিসেবে আবাদকৃত মটরশুটি বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে গাছের শিকড়স্থ নডিউলে জমা করে এবং পরে তা মাটিতে যোগ হয় এতে মাটির গুণাগুণ ও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নাইট্রোজেন ছাড়াও মাটিতে জৈব কার্বন, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে ভুট্টার দানাতেও একক ভুট্টা বপন পদ্ধতির চেয়ে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

ফসল: ভুট্টা ও মটরশুটি

মাটি: সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ থেকে এটেল দোআঁশ মাটি প্রযুক্তিটির জন্য ভালো। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোআঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম।

জাত: ভুট্টা- ভুট্টার যে কোনো জাত। মটরশুটি- বারি মটরশুটি-৩।

বপন/রোপণ সময়: অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

বপন/রোপণ দূরত্ব: ভুট্টা- সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেমি।

মটরশুটি- সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি।

বপন/রোপণ পদ্ধতি: চার সারি ভুট্টার পরে আট সারি মটরশুটি এরপর আবার চার সারি ভুট্টার পরে আট সারি মটরশুটি এভাবে বীজ বপন করা হয়।

বীজের হার (কেজি/হেক্টর): ভুট্টা- ২৫-৩০, মটরশুটি- ৭০-৮০

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	
	ভুট্টা	মটরশুটি
ইউরিয়া	৫৫০	১৩০
টিএসপি	২৬০	১৬০
এমওপি	২২০	৮০
জিপসাম	২৬০	৯০
জিংক সালফেট	১১	৬
বোরন সার	৬	-
গোবর সার	৫০০০	৫০০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

ভুট্টা: জমি প্রস্তুতির সময় সম্পূর্ণ গোবর এবং তিন ভাগের এক ভাগ ইউরিয়া এবং বাকি সকল সারের সম্পূর্ণ অংশ প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর এবং এক ভাগ ইউরিয়া বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করে সেচ দিতে হয়।

মটরশুটি: শেষ চাষের সময় এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ গোবরসহ সকল সারের সম্পূর্ণ অংশ প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে বীজ বপনের ২০ এবং ৩৫ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ: মাটিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা রাখা যাবে না। জমির আর্দ্রতার উপর নিভর করে ৩/৪টি সেচ দিতে হবে। ফুল আসার সময় ও ফল বড় হওয়ার সময় জমিতে পরিমাণ মত আর্দ্রতা রাখতে হবে।

আগাছা দমন: জমিতে আগাছার পরিমাণের উপর নির্ভর করে নিড়ানী দিতে হবে। যদি আগাছা বেশি থাকে তাহলে নিড়ানী বেশি দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

ভুট্টা: বপনের ১৪৫-১৫০ দিন পর পরিপক্ক ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়।

মটরশুটি: বপনের ৫৫ হতে ৭৫ দিন পর্যন্ত ২/৩ বার মটরশুটির সবুজ শুটি সংগ্রহ করা যায়।

ভুট্টার সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর): ভুট্টা-মটরশুটি: ১১.৫৫, ভুট্টা-মসুর: ৮.৭১, ভুট্টা-খেসারী: ৭.৪৯, একক ভুট্টা: ৭.৪০।

আয় - ব্যয়

বপন পদ্ধতি	মোট আয় (টাকা/হেক্টর)	মোট ব্যয় (টাকা/হেক্টর)	নিট মুনাফা (টাকা/হেক্টর)	আয়-ব্যয় অনুপাত
ভুট্টা-মটরশুটি ফালি পদ্ধতি	১৯৭৪৫০	৮০০০০	১১৭৪৫০	২.৪৭
একক ভুট্টা	১৪৬০০০	৯৬৫০০	৪৯৫০০	১.৫১

ফালি পদ্ধতিতে ভুট্টা ও মটরশুটি আন্তঃফসল

মটরশুঁটি পুষ্পায়ন পর্যায়

ভুট্টা দৈহিক বৃদ্ধি পর্যায় এবং মটরশুঁটি পরিপক্ক পর্যায়

প্রযুক্তি: উপকারী মাকড় নিওসেইলাস এর ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন

ক্ষতিকর মাকড় (Spider mite) এর আক্রমণ আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের সবজি, ফল এবং ফুল ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এই মাকড় প্রধানত গাছের পাতার রস চুষে খায় ফলে ফসলের বৃদ্ধি রহিত হয় এবং উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে কমে যায়। অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে দিন দিন এদের আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকগণ তাদের ফসলকে রক্ষা করার জন্য মূলত রাসায়নিক মাকড়নাশকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক মাকড়নাশক ব্যবহারের ফলে মাকড়গুলো প্রতিরোধী হয়ে উঠে। এতে উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। উক্ত সমস্যার প্রেক্ষিতে ক্ষতিকর মাকড় দমনে রাসায়নিক কীটনাশক এর বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী উপকারী মাকড়ের ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কীটতত্ত্ব বিভাগ বিএআরআই Neoseiulus longispinosus প্রজাতির উপকারী মাকড়ের ব্যাপক ভিত্তিক উৎপাদন কলা কৌশল উদ্ভাবন করেছে যা পরিবেশ সম্মত উপায়ে ক্ষতিকর মাকড় দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির বর্ণনা: উপকারী মাকড়ের ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদনের জন্য এর পোষক মাকড় (ক্ষতিকর মাকড়) এবং উপকারী মাকড়কে একই সাথে উৎপাদন করা হয়। ক্ষতিকর মাকড় সাধারণত শিম, পবগুন, ঢেঁড়স, কচু ইত্যাদিতে উৎপাদন করা হয়ে থাকে যা ক্ষতিকর মাকড়ের পোষক উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। নিম্নে কচু পাতায় উপকারী মাকড়ের উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

- ক্ষতিকর মাকড় আক্রান্ত কচু পাতা পেট্রিডিশে আর্দ্র স্পঞ্জের উপর রাখা হয়। পেট্রিডিসে অল্প পানি দিয়ে আর্দ্রতা বজায় রাখা হয়।
- প্রতিনিয়ত ক্ষতিকর মাকড়ের সংখ্যা মাইক্রোস্কোপের নিচে পর্যবেক্ষণ করা করা হয়।
- ক্ষতিকর মাকড়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত হলে প্রতি পাতায় চার জোড়া উপকারী মাকড় অবমুক্ত করে
- ক্ষতিকর মাকড়গুলো খাওয়ানো হয়।
- ২-৩ দিন অন্তর উপকারী মাকড়ের বেঁচে থাকা/খাওয়া পর্যবেক্ষণ করে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।
- নতুন উৎপাদিত পোষক মাকড় প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে উপকারী মাকড়ের এই স্টক কালচার সংরক্ষণ (maintain) করা হয়
- প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি পাতায় গড়ে ১১০টি মাকড় উৎপাদিত হয়ে থাকে।

ক্ষতিকর মাকড়

কচু জমিতে ক্ষতিকর মাকড়ের স্টক কালচার

কচু পাতায় উপকারী মাকড়ের পালন

গবেষণাগারে উৎপাদিত উপকারী মাকড়

প্রযুক্তি ব্যবহার উপযোগী এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী।

প্রযুক্তির উপকারিতা: প্রযুক্তিটি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে ক্ষতিকর মাকড়ের আক্রমণ দমন সম্ভব। এর মাধ্যমে রাসায়নিক বালাইনাশক মুক্ত ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে
স্বয়ম্ভরতা অর্জনে নিবেদিত বি-এআরআই

প্রকাশ: মে ২০২৫

Editorial & Publication
Training & Communication Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: 02 49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা: ২,০০০ কপি